নদীয়া জেলার খেলাধুলা ও ক্রীড়া সংগঠন: একটি ঐতিহাসিক সমীক্ষা (১৯৬৭-২০১৭)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ইতিহাস বিভাগে পিএইচ.ডি উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভের সারসংক্ষেপ

গবেষক

সন্তু হালদার

ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

রেজিস্ট্রেশন নম্বর: AOOHI0200420

তত্ত্বাবধায়ক

ড. সুদীপ সুন্দর দাস

অধ্যাপক, শারীর শিক্ষা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা- ৭০০০৩২

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

২০২৫

নদীয়া জেলার খেলাধুলা ও ক্রীড়া সংগঠন: একটি ঐতিহাসিক সমীক্ষা (১৯৬৭-২০১৭)

➢ ভূমিকা:

বর্তমানে ইতিহাস চর্চার দিগন্ত প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস চর্চার পাশাপাশি মানব সমাজের অন্যান্য বিষয়গুলিও ইতিহাস চর্চার প্রচলিত ঘরানায় নিজেদের স্থান করে নিচ্ছে। মানব কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্র যেমন বিচিত্র, তেমনি সেই বিচিত্র কর্মকাণ্ডের প্রায় সমস্ত ক্ষেত্র যথা– লোক সংস্কৃতি, সমাজে নারীর অবস্থান, বিজ্ঞান, পরিবেশ, জনস্বাস্থ্য ও ক্রীড়া বা খেলাধুলার মতো বিষয়গুলিও ইতিহাস চর্চার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোই, ইতিহাস রচনার বিষয়বস্তু হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। ইতিহাস চর্চার বিবর্তনের ধারায় আধুনিক ঐতিহাসিকেরা সার্বিক ইতিহাস (Total History) রচনার কথা বলেছেন, যা মানব অভিজ্ঞতার সমস্ত ক্ষেত্রকে ইতিহাস রচনার কাঠামোয় অন্তর্ভুক্তির স্বপক্ষে মত দেয়।[১] এই সার্বিক ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টা থেকে ক্রীড়া ইতিহাসের উৎপত্তি। মানব সভ্যতা ও সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল ক্রীড়া। ক্রীড়া ইতিহাস সার্বিক অর্থেই মানব সভ্যতা, সমাজ ও সংস্কৃতির বিবর্তন কে বোধগম্য করে তুলতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে, কারণ একদিকে ক্রীড়া ইতিহাসের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট সমাজের আর্থসামাজিক অবস্থা ও বিবর্তনকে যেমন অনুধাবন করা যায়, তেমনি অন্যদিকে সমাজের আর্থসামাজিক অবস্থা ক্রীড়া ক্ষেত্রকেও প্রভাবিত করে থাকে।

➢ গবেষণার সমস্যা নির্বাচন ও নির্ধারিত সময়ের যৌক্তিকতা:

পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম প্রাচীন জনপদ হল নদীয়া। নদীয়া সাংস্কৃতিক দিক থেকে যেমন এক সমৃদ্ধ জেলা তেমনি এর সুদীর্ঘ ক্রীড়া ইতিহাস রয়েছে, যা যথেষ্ট মনোযোগের দাবি রাখি। পশ্চিমবঙ্গের ক্রীড়া ইতিহাস নিয়ে একাধিক গবেষণাপত্র রচিত হলেও জেলা ভিত্তিক ক্রীড়া ইতিহাস নিয়ে গবেষণা সে অর্থে হয়নি। নদীয়া জেলার ক্রীড়া ইতিহাসের যথার্থ ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ গবেষণা পত্রটির মূল উদ্দেশ্য। গবেষণার সময়কাল হিসেবে ১৯৬৭ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত সময় কালকে নির্বাচন করা হয়েছে। উক্ত সময় পর্ব নির্বাচনের পশ্চাদে জেলার ক্রীড়া ইতিহাসের সঙ্গে সামঞ্জস্যতা বজায় রাখা হয়েছে। ২৩শে জানুয়ারি ১৯৬৭ সালে জেলার প্রধান ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা হিসেবে নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন (Nadia District Sport Association, N.D.S.A)- এর অধীনস্থ স্টেডিয়াম, যা একই সঙ্গে এন.ডি.এস.এ (N.D.S.A)- এর প্রধান কার্যালয় তার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয় কৃষ্ণনগর শহরে ফলে গবেষণা কার্যটির সূচনা

---

১. Arthur Marwick, *The New Nature of History: Knowledge Evidence, Language* (Houndmills: Palgrave, 2001), 88-90.

পর্ব হিসেবে উক্ত বছরটিকে বেছে নেওয়া হয়েছে। গবেষণা কার্যটির সমাপ্তি কাল হিসেবে ২০১৭ সালকে বেছে নেওয়া হয়েছে কারণ ওই বছর ভুবনেশ্বরে আয়োজিত এশীয় অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে ৪x৪০০ মিটার রিলে দৌড়ে জেলার মেয়ে দেবশ্রী মজুমদার সোনা জেতেন, যা ক্রিকেট ও ফুটবলের মতো জনপ্রিয় খেলার বাইরে এক উল্লেখযোগ্য সাফল্যকে তুলে ধরে।

➢ সাহিত্য পর্যালোচনা:

প্রথাগত জ্ঞানচর্চার কাঠামোই প্রথম ভারতীয় কর্তৃক ক্রীড়া বিষয়ক গবেষণার কথা আমরা জানতে পারি ১৯৮৮ সালে। ওই বছর সৌমেন মিত্র জহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ে ঔপনিবেশিক বাংলায় ফুটবলের ভূমিকা বিষয়ে তার গবেষণাপএ প্রদান করেন।[২] যা পরবর্তীকালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।[৩] ১৯৮০-এর দশক থেকে ভারতীয় ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানীরা ভারতে জনপ্রিয়তার নিরিখে সম্ভবত প্রথম স্থানাধিকারী ক্রীড়া হিসাবে ক্রিকেটের ইতিহাস রচনার বিষয়ে উদ্যোগী হন। রামচন্দ্র গুহ "A Corner of a Foreign Field"[৪], মিহির বসু "The Magic of Indian Cricket"[৫], এবং আশিস নন্দী "The Tao of Cricket"[৬] গ্রন্থে ভারতের ক্রিকেটের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। মারিও রদ্রিগেজ (Mario Rodriguaz) ক্রিকেটার রঞ্জিত সিং-এর রাজনৈতিক জীবনের বর্ণনা দিয়েছেন, যা ভারতের ক্রিকেটের ইতিহাসকেও বহুলাংশে আলোকিত করে।[৭]

---

২. Soumen Mitra, ''Nationalism, Communalism and Sub-regionalism: A Study of Football in Bengal,'' (M.Phil. diss., Centre for Historical Studies, Jawaharlal Nehru University, 1988).

৩. Soumen Mitra, *In Search of an Identity: History of Football in Colonial Calcutta* (Kolkata: Das Gupta and Co., 2006).

৪. Ramachandra Guha, *A Corner of a Foreign Field: The Indian History of a British Sport* (New Delhi: Penguin Books, 2014).

৫. Mihir Bose, *The Magic of Indian Cricket: Cricket and Society in India* (London: Routledge, 2006).

৬. Ashis Nandy, *The Tao of Cricket: On Games of Destiny and Destiny of Games* (New Delhi: Oxford University Press, 2000).

৭. Mario Rodriguaz, *Batting for the Empire: A Political Biography of Ranjitsinhji* (New Delhi: Penguin Books, 2003).

এছাড়াও এডওয়ার্ড ডকার (Edward Docker)[৮] ও রিচার্ড ক্যাশম্যান (Richard Cashmann)[৯] ভারতের ক্রিকেটের ইতিহাস বিষয়ে গবেষণা করেছেন। বোরিয়া মজুমদার ভারতীয় ক্রিকেটের সামাজিক ইতিহাসের বর্ণনা দিয়েছেন তার "Twenty Two Yards to Freedom" গ্রন্থে।[১০] ভারতে প্রচলিত আরেকটি জনপ্রিয় ক্রীড়া ফুটবল বিষয়েও একাধিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচিত হতে দেখা যায়। টনি মেসন (Tony Mason) "Football on the Maiden: Cultural Imperialism in India" প্রবন্ধে ব্রিটিশদের সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের একটি অংশ হিসেবে কলকাতার ময়দানে ফুটবল খেলার প্রচলনকে ব্যাখ্যা করেছেন।[১১] একবিংশ শতাব্দীতে দক্ষিণ এশীয় সমাজে খেলার ভূমিকাকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয় পশ্চিমী ঐতিহাসিকদের মধ্যে। এই প্রচেষ্টার একটি অন্যতম উজ্জ্বল প্রতিফলন হল পল ডিমিও (Paul Dimeo) ও জেমস মিলস (James Mills) কর্তৃক সম্পাদিত "Soccer in South Asia" গ্রন্থ।[১২] উক্ত গ্রন্থে ভারতীয় ফুটবল বিষয়ে একাধিক প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। বোরিয়া মজুমদার ও কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায় "Goalles: The Story of a Unique Footballing Nation" গ্রন্থে ভারতীয় ফুটবলে জাতীয়, প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক স্তরের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও টানাপোড়েনের বিষয়টি তুলে ধরেছেন এবং একই সঙ্গে ফুটবলের মাঠে সাম্রাজ্যবাদ, জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও বাণিজ্যিকতার প্রতিফলনের বিষয়টিও বর্ণনা করেছেন।[১৩] ঔপনিবেশিক দেশ গুলিতে পশ্চিমী খেলাধুলার আগমন, তার ইউরোপীয় প্রেক্ষাপট ও বিবর্তন বর্ণিত হয়েছে জে.এ. ম্যাঙ্গান (J.A.Mangan) রচিত "The Games Ethics and Imperialism" গ্রন্থে।[১৪] রনজয় সেন "A History of Sport in India" গ্রন্থে প্রাচীন যুগ থেকে উত্তর ঔপনিবেশিক যুগ পর্যন্ত ভারতে প্রচলিত

---

৮. Edward Docker, *History of Indian Cricket* (Delhi: Macmillan, 1976).

৯. Richard Cashmann, *Patrons, Players and the Crowd: The Phenomenon of Indian Cricket* (New Delhi: Oriental Longman, 1980).

১০. Boria Majumdar, *Twenty Two Yards to Freedom* (New Delhi: Penguin Books, 2004).

১১. Tony Mason, ''Football on the Maidan: Cultural Imperialism in Calcutta,'' in *The Cultural Bond: Sport, Empire and Society*, ed. J.A. Mangan (London: Frank Cass, 1992).

১২. Paul Dimeo and James Mills, eds., *Soccer in South Asia: Empire, Nation, Diaspora* (London: Routledge, 2001).

১৩. Boria Majumdar and Kausik Bandyopadhyay, *Goalless: The Story of a Unique Footballing Nation* (New Delhi: Penguin Book, 2006).

১৪. J.A. Mangan, *The Games Ethic and Imperialism: Aspects of the Diffusion of an Ideal* (London: Frank Cass, 2003).

বিভিন্ন ক্রীড়ার ধারাবাহিক বর্ণনা তুলে ধরেছেন।[১৫] জেমস মিলস (James Mills) সম্পাদিত "Subaltern Sports" গ্রন্থটি ভারতীয় খেলার ইতিহাসে নিম্নবর্গীয় ধারা ও অংশগ্রহণের বিষয়টি আলোকিত করেছে।[১৬] ভারতে খেলার ইতিহাস বিষয়ক অধিকাংশ গবেষণা মূলত ক্রিকেট ও ফুটবলের মতো দুটি জনপ্রিয় ক্রীড়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। তবে বর্তমানে এক্ষেত্রে কিছু উজ্জ্বল ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হচ্ছে ফলে অলিম্পিকে ভারত কিংবা ভারত ও কমনওয়েলথ গেমস- এর মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিও খেলার ইতিহাস চর্চায় সংযোজিত হয়েছে।[১৭] এই ধারারই একটি নিদর্শন হল বোরিয়া মজুমদার ও নলিন মেহেতা রচিত "Olympics: The Indian Story" গ্রন্থটি।[১৮]

➢ গবেষণার অনুমান ও সম্পর্কিত প্রশ্নাবলী:

সামাজিক গবেষণায় অনুমান একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এই অনুমান সর্বদাই তথ্য নির্ভর হওয়া একান্ত আবশ্যক। জ্ঞান ও তত্ত্ব থেকে উদ্ভূত আপাত স্থিরিকৃত ধারণা বা বিবৃতি যা অন্যান্য অজানা তথ্য ও তত্ত্ব অনুসন্ধানের পথপ্রদর্শক হিসেবে সাহায্য করে থাকে, সাধারণ অর্থে তাকেই অনুমান বলা হয়ে থাকে। এই অনুমানের উপর ভিত্তি করে সর্বপ্রথম গবেষণার শিরোনামটি নির্ধারণ করা হয়েছে। আমার চয়ন করা এই শিরোনাম নিয়ে পূর্বে কেউ কাজ করেছে কিনা? অথবা আমার দেওয়া শিরোনামের সঙ্গে মিল আছে কিনা?- ইত্যাদি অনুসন্ধান করা হয়েছে এবং এই অনুসন্ধানের মাধ্যমে যখন আমি নিশ্চিত হয়েছি যে এই শিরোনামটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র তখন আমি শিরোনাম হিসাবে "নদীয়া জেলার খেলাধুলা ও ক্রীড়া সংগঠন: একটি ঐতিহাসিক সমীক্ষা (১৯৭৬-২০১৭)" -টিকে বেছে নিয়েছি।

উক্ত শিরোনামে গবেষণার জন্য কি ধরনের তথ্য সংগ্রহ করা দরকার, কেমন ধরনের বিষয় গত সুস্পষ্টতা তুলে ধরা দরকার, বিষয়ের সাথে সঙ্গতি রেখে কেমন ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন করা উচিত, কেমন ধরনের নকশা প্রণয়ন-নির্ধারণ ও অবয়ব গঠন করা উচিত এবং পরিকল্পনামাফিক অধ্যায় বিন্যাস কেমন হওয়া বাঞ্ছনীয়

---

১৫. Ronojoy Sen, *Nation at Play: A History of Sport in India* (New York: Columbia University press, 2015).

১৬. James H. Mills, ed., *Subaltern Sports: Politics and Sports in South Asia* (London: Anthem Press, 2005).

১৭. কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *খেলা যখন ইতিহাস: সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি* (সেতু প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৯), ৭।

১৮. Boria Majumdar and Nalin Mehta, *Olympics: The Indian Story* (London: Routledge, 2008).

ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিচালক, নির্দেশক তথা সর্বোপরি পথপ্রদর্শক হিসেবে সাহায্য করেছে অনুমান।

উক্ত গবেষণা কার্যটি যে প্রশ্নগুলোকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে সেগুলি হল-

১. খেলাধুলার যথার্থ সংজ্ঞা কী?

২. খেলাধুলা কিভাবে প্রথাগত ইতিহাস চর্চার কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত হল?

৩. নদীয়া জেলায় কিভাবে পাশ্চাত্য খেলাধুলার প্রচলন হয়?

৪. প্রাথমিক পর্যায়ে জেলার কোন কোন অঞ্চলে, কোন কোন খেলা গুলি বিস্তার লাভ করেছিল?

৫. খেলা গুলি কিভাবে সংগঠিত হয় এবং কিভাবে খেলাধুলা গুলিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সংগঠন গড়ে ওঠে?

৬. খেলাধুলা প্রসারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ক্রীড়া সংগঠনগুলি কী ধরনের ভূমিকা পালন করেছে?

৭. বিভিন্ন সময় পর্বে, বিভিন্ন খেলাধুলা গুলির জনপ্রিয়তা ও প্রসারের ক্ষেত্রে কী ধরনের তারতম্য লক্ষ করা যায়?

৮. আঞ্চলিক থেকে আন্তর্জাতিক স্তর পর্যন্ত, খেলাধুলার বিভিন্ন পর্যায়ে জেলার খেলোয়াড় ও ক্রীড়া সংগঠকরা কী ধরনের অবদান রেখেছেন তা বিশ্লেষণ করা?

৯. খেলার মাধ্যমে জেলার আর্থসামাজিক পেক্ষাপটের কী চিত্র ফুটে ওঠে?

১০. খেলাধুলায় নারী ও বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর কী ধরনের অবদান লক্ষ করা যায়? ইত্যাদি।

➢ গবেষণার উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য:

গবেষণা কার্যের উদ্দেশ্য গুলি হল- নদীয়া জেলার প্রধান ক্রীড়া নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে এন.ডি.এস.এ ও তার অধীনস্থ বা অনুমোদিত ক্লাবগুলোর ইতিহাস বর্ণনা, জেলার ক্রীড়া ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলিকে চিহ্নিত করণ, জেলার বিশিষ্ট ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব ও তাদের সাফল্যের ইতিবৃত্ত বর্ণনা এবং সর্বোপরি ক্রীড়ার মাধ্যমে ধারক সমাজের যে বৈশিষ্ট্য ও বিবর্তনের ধারা প্রতিফলিত হয় তা বিশ্লেষণ করা।

➢ গবেষণার পদ্ধতি:

এই গবেষণাটি মূলত একটি আন্তঃবিষয় অধ্যায়ন। গবেষণার ক্ষেত্রে ক্রীড়া ইতিহাস বিষয়ক বিভিন্ন তত্ত্ব ও তার বিশ্লেষণের জন্য একাধিক পুস্তকের সাহায্য নেওয়া হয়েছে এবং জেলার ক্রীড়া বিষয়ক তথ্য সংগ্রহের জন্য ক্ষেত্র সমীক্ষার মাধ্যমে জেলার বিভিন্ন গ্রন্থাগার, ক্রীড়া সংগঠন ও ক্লাবের নথিপত্র, বার্ষিক কর্ম বিবরণী, প্রচার পুস্তিকা, ক্রীড়া বিষয়ক সংবাদপত্র, বার্ষিক হিসাব বিবরণী, সংগঠনের শাসনতান্ত্রিক পুস্তিকা প্রভৃতি থেকে প্রাথমিক তথ্য সংগৃহিত হয়েছে। এছাড়াও তথ্য সংগ্রহের জন্য মৌখিক ইতিহাসের উপাদান হিসেবে জেলার ক্রীড়া সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ক্রীড়াবিদদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। সমসাময়িক বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রতিবেদনও তথ্যভাণ্ডার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

➢ গবেষণা সন্দর্ভের অধ্যায় বিন্যাস:

বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভটি কয়েকটি অধ্যায়ে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে, যা নিম্নে বর্ণিত-

- **প্রথম অধ্যায়- ভূমিকা:**

গবেষণার উদ্দেশ্য, পরিধি ও অধ্যায় বিন্যাস দেখানো হয়েছে এবং সেই সংক্রান্ত প্রাথমিক ধারণা প্রদান করা হয়েছে।

- **দ্বিতীয় অধ্যায়- খেলার সংজ্ঞা, ইতিহাস চর্চা ও সমাজের সাথে সম্পৃক্ততা:**

খেলার ইতিহাস রচনা সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে খেলা বা ক্রীড়া বলতে কী বোঝায় অর্থাৎ উক্ত বিষয়ের সংজ্ঞা নির্ধারণ ও সেই সংক্রান্ত জটিলতার বিষয়টি আলোচনা করা যেতে পারে। বাংলা ভাষায় 'খেলা' বা 'ক্রীড়া' শব্দ দুটি প্রায় সমার্থক অর্থে ব্যবহৃত হলেও উভয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য বর্তমান। 'খেলা' শব্দটিকে অনেক বিস্তৃত অর্থে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যার ফলে এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে অসংখ্য অপ্রতিযোগিতা বা অপ্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক খেলা যথা- ছোরা খেলা। অপরদিকে 'ক্রীড়া' শব্দটিকে ব্যবহার করা হয়েছে মূলত প্রতিদ্বন্দ্বিতা মূলক খেলা বোঝাতে যথা মল্লক্রীড়া।[১৯] বাংলা 'খেলা' ও 'ক্রীড়া' শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হল 'Play', 'Game', 'Spor't। বাংলা ভাষায় 'খেলা' ও 'ক্রীড়া' শব্দ দুটির মধ্যে পার্থক্য প্রায় নগণ্য হলেও ইংরেজি 'Play', 'Game' ও 'Sport' শব্দগুলির মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বর্তমান। 'Play' শব্দটিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে "To do things for pleasure,

---

১৯. *সংসদ বাংলা অভিধান,* ষষ্ঠ মুদ্রণ। (কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ২০০৪), ২৩৩, ২১৫।

as children do, to enjoy yourself, rather than work"[২০] অর্থাৎ খেলার ক্ষেত্রে কোন কিছু করার স্বাধীনতাই হল মুখ্য। এক্ষেত্রে আনন্দ খেলায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে। যদিও এর সঙ্গে স্বাস্থ্যের উন্নতি, চরিত্রের বিকাশ ঘটানো, সামাজিকীকরণের মতো বিষয়গুলি সংযুক্ত। বিভিন্ন মনোবিদ, দার্শনিক, ক্রীড়াবিজ্ঞানী ক্রীড়ার বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন।

বিভিন্ন মনোবিদ খেলা বা ক্রীড়া- এর সংজ্ঞা সংক্রান্ত বিভিন্ন সুচিন্তিত মতবাদ প্রদান করেছেন, প্রথমে যা উল্লেখের দাবি রাখে। মনোবিদ রস (Ross) বলেছেন, "Play is joyful, spontaneous, creative activity in which man find his fullest self expression."।[২১] ম্যাকডুগাল (McDougall) উল্লেখ করেছেন, "Play is the outcome of the primal libido or vital energy flowing not in the channel of instinct, but over flowing, generating a vague appetite for movement and finding out let it any or all the motor mechanism in turn"।[২২] হার্লক (Hurlock) বলেছেন, "play relates to any activity engaged in for the enjoyment it gives, without consideration of the end result."।[২৩] রায়বার্ন (Ryburn) উল্লেখ করেছেন, "Play is a way, a means which is used by the self when the different instinctive urges are trying to express themselves."।[২৪]

ঐতিহাসিক ও নৃতত্ত্ববিদরাও ক্রীড়া সংজ্ঞা নির্ধারণ সংক্রান্ত জটিলতায় অংশগ্রহণ করেছেন এবং এই বিষয়ে বিভিন্ন মতামত প্রদানের মাধ্যমে বা সমালোচনার মাধ্যমে আমাদের জ্ঞানভান্ডার কে আরোও সমৃদ্ধ করেছেন। ডাচ ঐতিহাসিক জন হুইজিঙ্গ (John Huizinga) ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত "Homo Ludens" (Man

---

২০. *Oxford Advanced Learners Dictionary*, 8th Edition. (Oxford: Oxford University Press, 2010), 637.

২১. James S. Ross, *Ground Work of Educational Psychology* (London: George G. Harpar and Co. Limited, 1953), 61.

২২. সুশীল রায়, *শিক্ষা তত্ত্ব ও শিক্ষা দর্শন* (কলকাতা: বুক হাউস, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ), ২০১।

২৩. E.B. Hurlock, *Child Development* (New York: McGrow- Hill Book Company, 1942), 337.

২৪. W.M. Ryburn, *Introduction to Educational Psychology* (London: Oxford University Press, 1965), 280.

the Player) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে সকল মানবিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে খেলার উপাদান বা বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। তার মতে ক্রীড়া হল স্বাধীনতা এবং দৈনন্দিন জীবনের বাইরে পদার্পণের একটি মাধ্যম।[২৫] তিনি উল্লেখ করেছেন, "All peoples play, and play remarkably alike, but their languages differ widely in their conception of play...".[২৬] ১৯৬০- এর দশকে ফরাসি নৃতত্ত্ববিদ রজার ক্যালিওস (Roger Caillois), হুইজিঙ্গ-এর মতের সমালোচনা করে ক্রীড়ার একটি পরিশোধিত সংজ্ঞা প্রদান করে বলেছেন, "In effect, play is essentially a separate occupation, carefully isolated from the rest of life, and generally is engaged in with precise limits of time and space.".[২৭] এছাড়াও তিনি ক্রীড়া কে কতগুলি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন।[২৮] উপরোক্ত মতামতগুলি মূলত ইংরেজি 'Play' শব্দটিকে ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বিভিন্ন চিন্তাবিদ কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছে। ইংরেজি 'Game' শব্দটি বলতে বোঝায় "An activity or a sport with rules in which people or teams compete each other.".[২৯] স্বতঃপ্রবৃত্ত ক্রীড়া যখন নির্দিষ্ট নিয়মাবলির বাঁধনে আবদ্ধ হয়ে, নির্দিষ্ট স্থান, নির্দিষ্ট সময় ও নির্দিষ্ট পরিসংখ্যানের চৌহদ্দিতে সীমাবদ্ধ হয় তখন তাকে 'Game' বলা হয়ে থাকে, অর্থাৎ 'Game'- এর ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্ততা দমিত হয়ে, ক্রীড়ার সাংগঠনিক জটিলতা ও নিয়ম-কানুন মুখ্য হয়ে ওঠে।[৩০] অপরদিকে ইংরেজি 'Sport' শব্দটিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, "Activity that you do for pleasure and that needs physical effort or skill, usually done in a special area and according to fix rules.".[৩১] 'Game'- এর বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সাংগঠনিক ব্যাপকতা ও প্রতিযোগিতা প্রাধান্য পেয়েছে। আর এই আনুষঙ্গিক সংযোজনের ফলে 'Game' ক্রম বিবর্তিত হয়ে যে নবরূপ লাভ করে তাকে 'Sports' বলা হয়ে থাকে।[৩২]

---

২৫. John Huizinga, *Homo Ludens: A Study in Play Element in Culture* (Boston: The Beacon Press, 1960), 7.

২৬. Ibid., 28.

২৭. Roger Caillois, *Man, Play and Games* (Chicago: University of Illinois Press, 2001), 6.

২৮. Ibid., 16-23.

২৯. *Oxford Advanced Learners Dictionary*, 8th Edition. (Oxford: Oxford University Press, 2010), 1159.

৩০. জিয়াউল আলম, "শরীর চর্চার আলোকে বাংলার লোকক্রীড়ার সন্ধান," (পিএইচ.ডি গবেষণা নিবন্ধ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০২), ৩।

৩১. *Oxford Advanced Learners Dictionary*, 8th Edition. (Oxford: Oxford University Press, 2010), 357.

৩২. আলম, "শরীর চর্চার আলোকে বাংলার লোকক্রীড়ার সন্ধান," ৩-৪।

মার্কিন ঐতিহাসিক অ্যালান গাটম্যান (Allen Guttmann) তার, "From Ritual to Record" গ্রন্থে, হুইজিঙ্গ- এর ক্রীড়া বিষয়ক মতের তীব্র সমালোচনা করেছেন। বিশেষত হুইজিঙ্গ যেভাবে বিভিন্ন ধরনের খেলা ও প্রতিযোগিতার মধ্যে বিভাজন না করে সমস্ত ধরনের প্রতিযোগিতা কে ক্রীড়া হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তার তীব্র বিরোধিতা করেছেন গাটম্যান। তিনি Play, Game ও Sport- এর মধ্যে পার্থক্যগুলিকে সুস্পষ্ট ভাবে চিহ্নিত করেছেন। 'Play' বলতে তিনি বুঝিয়েছেন, "Play is any nonutilitarian physical or intellectual activity pursued for its own sake."।[৩৩] এই 'Play' কে তিনি দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন, প্রথমত স্বতঃস্ফূর্ত খেলা (Spontaneous play) ও দ্বিতীয়ত সংগঠিত খেলা (Organised play)। দ্বিতীয় শ্রেণি ভুক্ত সংগঠিত খেলাকে 'Game' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কোন খেলাকে 'Game' পর্যায়ে উন্নীত হতে গেলে তাকে অবশ্যই কিছু নিয়ম নীতির দ্বারা শৃঙ্খলায়িত হতে হবে, "..but most play is regulated and rule bound."।[৩৪] 'Sport' বলতে তিনি বুঝিয়েছেন, "...'playful' physical contests, that is, as nonutilitarian contest which include and important measure of physical as well as intellectual skill."।[৩৫] তিনি আধুনিক ক্রীড়ার সূচনা পর্ব হিসেবে অষ্টাদশ শতককে চিহ্নিত করেছেন এবং অষ্টাদশ শতক পরবর্তী আধুনিক ক্রীড়ার সঙ্গে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ক্রীড়ার পার্থক্যকে চিহ্নিত করেছেন। ওয়েবারিয়ান (Weberian) মডেলকে ব্যবহার করে আধুনিক ক্রীড়ার সাতটি বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করেছেন তিনি যথা– ধর্মনিরপেক্ষতা, সুযোগের সমতা, যুক্তিবাদিতা, বিশেষীকরণ, পরিমাপ যোগ্যতা, আমলাতান্ত্রিক সংগঠন এবং রেকর্ড- এর প্রতি আকর্ষণ। আধুনিক ক্রীড়ার প্রকৃতি বিষয়ে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, "Once the Gods have vanished from Mount Olympus or from the Dante's paradise, we can no longer run to appease them or to save our souls, but we can set a new record. It is a uniquely modern form of immortality."[৩৬]

ইংরেজি 'Play', 'Game' এবং 'Sport' শব্দগুলি ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করলেও যেহেতু এই তিনটি শব্দটিকে বাংলায় 'ক্রীড়া' বা 'খেলা' বলা হয়ে থাকে, তাই এই গবেষণাপত্রে 'ক্রীড়া' ও 'খেলা' শব্দ দুটিকে সমার্থক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে ক্রীড়া বা খেলা বলতে আধুনিক ক্রীড়া বা ইংরেজি 'Sport'– কে বোঝানো হয়েছে, অর্থাৎ যে সমস্ত ক্রীড়াগুলি সংগঠিত ভাবে, সংগঠনের অধীনে, প্রতিযোগিতা মূলক ভাবে সংঘটিত হয়ে থাকে সেই সমস্ত ক্রীড়াকেই গবেষণার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

---

৩৩. Allen Guttmann, *From Ritual to Record* (New York: Columbia University Press, 2004), 3.

৩৪. Ibid., 4.

৩৫. Ibid., 18.

৩৬. Ibid., 55.

ঐতিহাসিক ই.জে. হবসবম (E.J. Hobsbowm) ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নতুন সামাজিক অভ্যাস হিসেবে ক্রীড়াকে অভিহিত করেছেন।[৩৭] কিন্তু প্রথাগত ইতিহাস চর্চার কাঠামোতে খেলাধুলাকে যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করা হয়নি। প্রাথমিক পর্যায়ে মূলত নৃতাত্ত্বিকরা ক্রীড়া বিষয়টিকে প্রথাগত জ্ঞানচর্চার কাঠামোয় অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছিলেন।[৩৮] এডওয়ার্ড বার্নেট টেইলর (Edward Burnett Taylor) যাকে অনেক সময় নৃতত্ত্বের জনক হিসেবে অভীভূত করা হয়ে থাকে, তিনি ১৮৭৯ সালে রচিত "The History of the Games" প্রবন্ধে বিভিন্ন ধরনের খেলার বিষয়ে আলোচনা করেছেন। মার্কিন নৃতত্ত্ববিদ জেমস মুনি (James Mooney) এবং স্টিয়ার্ট কুলিন (Stewart Culin) আমেরিকার আদিম অধিবাসী (Native American) দের মধ্যে প্রচলিত ক্রীড়া গুলির বিষয়ে আলোচনা করেছেন।[৩৯] ডাচ ঐতিহাসিক জন হুইজিঙ্গ (John Huizinga) ১৯৩৮ সালে রচিত "Homo Ludens"- গ্রন্থে খেলার বিষয়ে আলোচনা করেছেন।[৪০] ১৯৬০- এর দশকে ফরাসি নৃতত্ত্ববিদ রজার ক্যালিওস (Roger Caillios), হুইজিঙ্গা-এর খেলা বিষয়ক মতের বিরোধিতা করে ক্রীড়া বিষয়ে নিজস্ব বক্তব্য তুলে ধরেন "Man, Play and Games" গ্রন্থে।[৪১] সমাজতত্ত্ববিদ নরবাট এলিশ (Norbert Elias) এবং এরিক ডানিং (Eric Dunning) ক্রীড়ার ক্রমবিকাশ বর্ণনা করতে গিয়ে ক্রীড়ার উদ্ভবকে সভ্যতার ক্রমবিকাশ (Civilizing Process)- এর একটি অংশ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।[৪২]

---

৩৭. Eric Hobsbowm and Terence Ranger, eds., *The Invention of Tradition* (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), 298.

৩৮. Ronojoy Sen, *Nation at Play: A History of Sport in India* (New York: Columbia University press, 2015), 3.

৩৯. Kendall Blanchard, ''The Anthropology of Sport,'' in *Handbook of Sports Studies*, ed. Jay Coakley and Eric Dunning (London: Sage Publication, 2000), 145.

৪০. John Huizinga, *Homo Ludens: A Study in Play Element in Culture* (Boston: The Beacon Press, 1960).

৪১. Roger Caillois, *Man, Play and Games* (Chicago: University of Illinois Press, 2001).

৪২. Norbert Elias and Eric Dunning, *Quest for Excitement: Sport and Leisure in the Civilizing Process* (Oxford: Basil Blackwell, 1986).

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে প্রথাগত ইতিহাস চর্চার ঘরানায় ক্রীড়া বিষয়ক রচনা ক্রমশ নিজের স্থান করে নিতে থাকে। ইউরোপ সহ পশ্চিমী বিশ্বে ক্রীড়া ইতিহাস চর্চার সূচনা হয় ১৯৭০-এর দশকে এবং তা বিশেষভাবে প্রসার লাভ করে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে ১৯৮০-এর দশকে কারণ ১৯৮২ সালে "British Society of Sport History" প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ক্রীড়া ইতিহাস চর্চা একটি সাংগঠনিক রূপ লাভ করে। Frank Cass প্রকাশনায় ক্রীড়া ইতিহাসচর্চার এই সংগঠনের গবেষণা পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে যা বর্তমানে "The International Journal of the History of Sport" নামে পরিচিত। সমাজবিজ্ঞানী জে.এ. ম্যাঙ্গান (J.A. Mangan), টনি ম্যাসন (Tony Mason), এলান গাটম্যান (Allen Guttmann), রিচার্ড হোল্ট (Richard Holt) প্রমুখদের গবেষণায় ক্রীড়া ইতিহাস চর্চা আরও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। ক্রীড়া ইতিহাস চর্চার এই উদ্যোগ ক্রমশ ব্রিটেনের বাইরে ইউরোপের অন্যান্য দেশে যথা– ডেনমার্ক, সুইডেন ও ফিনল্যান্ডের মতো দেশে ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং চীন, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার মতো এশীয় দেশগুলির সমাজবিজ্ঞানী গণও ১৯৮০-এর দশকের শেষ পর্ব থেকে এই প্রয়াসের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করতে থাকেন। ইউরোপে ক্রীড়া ইতিহাস চর্চার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রচারক জে.এ. ম্যাঙ্গান-এর উদ্যোগে স্কটল্যান্ড-এর স্টেট ক্লাউড বিশ্ববিদ্যালয়ে (University of Strathclye) গড়ে ওঠে "International Research Centre for Sport, Socialization and Society" (IRCSSS), যা পরবর্তীকালে ইংল্যান্ডের ডি মন্টফোর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে (De Montfort University) স্থানান্তরিত হয়। জে.এ. ম্যাঙ্গান-এর সম্পাদনায় Frank Cass প্রকাশনার অধীনে ১৯৯৮ সালে "Culture, sports, society", ১৯৯৯ সালে "European Sport History Review" এবং ২০০০ সালে "Soccer and Society" নামে তিনটি গবেষণামূলক পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে, যার মধ্যে "Culture, Sports, Society" নামক পত্রিকাটি বর্তমানে "Sport in Society" নামে প্রকাশিত। এই একই সময় কালে "Sport in Global Society" নামে একটি সিরিজের অধীনে অনেক গুলি একক ও সম্পাদিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, Frank Cass প্রকাশনায়, যা পরবর্তীকালে Routledge প্রকাশনার দ্বারা অধিগৃহীত হয়।[৪৩]

ক্রীড়া ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক ও তার বিশ্লেষণের বিষয়টিও যথেষ্ট জটিল এবং এক্ষেত্রেও বিতর্ক লক্ষ করা যায়। অনেক ক্ষেত্রেই প্রথাগত ইতিহাস চর্চার কাঠামোই ক্রীড়া কে অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে তীব্র বক্তব্য পেশ করা হয়ে থাকে। খেলাধুলা যে কোনো সমাজে সাংস্কৃতিক জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ যা ওই সমাজের বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরে। ক্রীড়া ইতিহাস বলতে কোনো খেলার পরিসংখ্যানগত ইতিহাসকে বোঝায় না, বরং খেলার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, অর্থনৈতিক ভাবনা, কূটনীতি ও সাংস্কৃতিক বিভিন্ন রূপের যে প্রতিফলন ঘটে তার ইতিহাস কে বোঝায়।[৪৪] খেলার ইতিহাসের গুরুত্ব কে তুলে ধরতে খেলার

---

৪৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, *খেলা যখন ইতিহাস*, ৬।

৪৪. তদেব, ১-২।

ইতিহাসের অন্যতম রূপকার জে.এ. ম্যাঙ্গান লিখেছেন, বর্তমানে ক্রীড়া সমাজে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে যে তা কেবলমাত্র খেলোয়ারদের বিষয় হিসেবে সীমাবদ্ধ না থেকে ক্রমশ এক জনগণের বিষয় হয়ে উঠেছে, যা রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, শিক্ষা বিশেষজ্ঞ ও গবেষকদের কাছে সমান আকর্ষণীয়।[৪৫] খেলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তাৎপর্য বিদ্যমান যা একমাত্র যথার্থভাবে উপলব্ধি করা যায় যদি আমরা প্রথাগত অবসর বিনোদনের কাঠামোর বাইরে গিয়ে, বৃহত্তর ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রেক্ষিতে খেলার তাৎপর্য কে ব্যাখ্যা করি। দক্ষিণ এশিয়া তথা ভারতে খেলা সর্বদা বৃহত্তর ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত থেকেছে। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে ভারতে সাম্রাজ্যবাদ, জাতীয়তাবাদ, আঞ্চলিকতাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, অব-ঔপনিবেশীকরন, দেশভাগ, শরণার্থী সমস্যা, কূটনীতি, বাণিজ্যিকতা প্রভৃতি প্রকরণ গুলি বিভিন্ন খেলার বিবর্তনের ইতিহাসে যেভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তা একমাত্র জানা যায় খেলা গুলির সামাজিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে।[৪৬] ১৯১১ সালে মোহনবাগান কর্তৃক শীল্ড বিজয় সম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে দেশীয় জনগণের জয়ের একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে গড়ে ওঠে, যা ফুটবল খেলার মাঠকে গড়ে তোলে জাতীয়তাবাদের প্রকাশের একটি আদর্শ ক্ষেত্র।[৪৭] ১৯৪৭ সালে দেশভাগ জনিত কারণে পূর্ববঙ্গ থেকে বহুসংখ্যক মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন এবং গৃহহীন, সম্বলহীন এই সমস্ত মানুষের কাছে দৈনন্দিন জীবন হয়ে ওঠে সংগ্রামের এক ক্ষেত্র। একই সঙ্গে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত এই সমস্ত মানুষের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের পুরাতন অধিবাসীদের সম্পর্কের নানা টানাপোড়েন ফুটবল খেলার মাঠকেউ স্পর্শ করে, যার প্রতিফলন লক্ষ করা যায় কলকাতার দুই নামী ক্লাব মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের ফুটবলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে। যদিও এই ক্লাব দুটির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল দেশভাগের বহু পূর্বে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকালে এবং দুই দলের ফুটবল খেলোয়াড়দের মধ্যেই দুই বঙ্গের প্রতিনিধিত্ব লক্ষ করা যায়। তথাপি দেশভাগ পরবর্তী শরণার্থী সমস্যা দুই দলের প্রতিদ্বন্দিতাকে নতুন মাত্রা দান করে, সাংস্কৃতিক স্তরে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব যেন হয়ে ওঠে উদ্বাস্তু মানুষের প্রতিনিধি।[৪৮]

স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পর থেকেই ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে রাজনৈতিক সম্পর্ক সর্বদাই অম্লমধুর। তবে দুটি দেশের মধ্যে একাধিক যুদ্ধ সত্ত্বেও ক্রিকেট খেলার মাধ্যমে দ্বিপাক্ষিক আদান-প্রদান ও কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াস দেখা গেছে একাধিকবার। যার সূচনা হয়েছিল ১৯৫২ সালে এবং এর

---

৪৫. J.A. Mangan, "Series Editor's Foreword," in *Sporting Nationalism: Identity, Ethnicity, Immigration, Assimilation*, ed. Mike Cronin and David Myall (London: Frank Cass, 1998).

৪৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, *খেলা যখন ইতিহাস*, ২।

৪৭. তদেব, ৪৫–৪৯।

৪৮. তদেব, ৮৭-৮৯।

সাম্প্রতিকতম উদাহরণ হল ২০০৪ সালের ভারতের 'শুভেচ্ছা' সফর।[৪৯] স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৪৮ সালের লন্ডন অলিম্পিকে স্বাধীন দেশ হিসেবে ভারত প্রথমবার অংশগ্রহণ করে, হকি খেলার ফাইনালে এতদিন যাদের হাতে পরাধীন ছিল, সেই ঔপনিবেশিক শাসক অর্থাৎ ব্রিটেন কে পরাজিত করে বিজয় লাভ, এক অন্যতম সেরা সময় হিসাবে রয়ে গেছে ভারতীয় হকি জগতে।[৫০] উপরোক্ত নিদর্শন থেকে বলা যায় যে খেলার মাঠ সর্বদাই ক্রীড়া প্রতিদ্বন্দ্বিতার বাইরেও এক বৃহত্তর সমাজের প্রতিফলক হয়ে উঠেছে, যার যথার্থ ইতিহাস রচিত হলে আমাদের সামাজিক জ্ঞান আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। যথার্থ ক্রীড়া ইতিহাস রচিত হলে ভবিষ্যতের তারকারা বেড়ে উঠতে পারে অতীত বোধ নিয়ে, যে ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার তারা বহন করছে সেই সম্পর্কেও তাদের মনে একটা ধারণা তৈরি হয়।[৫১] সর্বোপরি ক্রীড়া ইতিহাস দেখিয়ে দেয় ঔপনিবেশিক ও তার অব্যবহিত পরের যুগেও ভারতের খেলাধুলার সঙ্গে জনসংস্কৃতির একটি নিবিড় যোগ বর্তমান, কিন্তু এই সম্পর্কে খুব কমই জানা যায় এবং তা নিয়ে গবেষণা হয়েছে খুব সামান্যই। ভারতে প্রচলিত প্রথাগত ইতিহাস চর্চা ফুটবল বা ক্রিকেট খেলার গুরুত্বকে জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতাবাদ, জনপ্রিয় সংস্কৃতি ও বাণিজ্যিকতার প্রতিফলক রূপে তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছে, যা ক্রীড়া ইতিহাস রচিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরে।[৫২] ঐতিহাসিক রামচন্দ্র গুহ খেলার ভারতীয় ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে দুটি দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখ করেছেন- প্রথম দৃষ্টিভঙ্গি খেলার অভ্যাস, পৃষ্ঠপোষক ও খেলোয়াড়, সংগঠন ও প্রতিযোগিতা প্রভৃতি আলোচনায় সীমায়িত, আর দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গি খেলার মাধ্যমে বৃহত্তর বিষয়কে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস করে, আর তিনি এই দ্বিতীয় দৃষ্টিকোণ কেই খেলার ইতিহাস রচনার আদর্শ গুণ বলে মনে করেন।[৫৩] এক্ষেত্রে উভয় দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমেই ক্রীড়া ইতিহাস সার্থক রূপ লাভ করতে পারে।

- **তৃতীয় অধ্যায়- ভারতে খেলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস:**

খেলাধুলা মানব জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং প্রাচীনকাল থেকেই প্রতিটি আদিম সমাজে কিছু খেলাধুলার প্রচলন লক্ষ করা যায়, যা উক্ত সমাজের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরে। ভারতবর্ষও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। প্রাচীন কাল থেকেই ভারতীয় সমাজে নানা ক্রীড়ার প্রচলন ছিল যার সঙ্গে নতুন ক্রীড়া সময়ের

---

৪৯. তদেব, ১১৪-১১৭।

৫০. মজুমদার বোরিয়া, *শতশিল্পে আলোকিত ভারতের ক্রীড়া ইতিহাস,* দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ৮৪।

৫১. তদেব, ৭।

৫২. বন্দ্যোপাধ্যায়, *খেলা যখন ইতিহাস,* ৩।

৫৩. Ramachandra Guha, ''Cricket and Politics in Colonial India,'' *Past and Present*, no.161 (November 1998): 155-190.

সঙ্গে সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে। ক্রীড়া বিষয়ক যেকোনো আলোচনার পূর্বে ভারতের ক্রীড়া ইতিহাসের বিবর্তন সম্পর্কে একটি ধারণা থাকা একান্ত প্রয়োজন। শিকার সম্ভবত ক্রীড়া গুলির মধ্যে প্রাচীনতম। প্রাগৈতিহাসিক যুগে আদি মানবের দৈনন্দিন জীবনযাপন তথা খাদ্যের জন্য বন্য পশুর শিকার এক আবশ্যিক শর্ত হলেও সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শিকার সমাজে মূলত অভিজাত সামরিক প্রধান ও শাসকদের ব্যক্তিগত পরাক্রম ও দক্ষতা প্রদর্শনের এক বিনোদনমূলক ক্রীড়ার রূপ লাভ করে। ভারতীয় উপমহাদেশে এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত প্রাচীনতম নাগরিক সভ্যতা হিসেবে হরপ্পা সভ্যতার মানুষদের মধ্যে মল্লযুদ্ধ ও শিকারের মতো ক্রীড়াগুলি প্রচলিত থাকার কথা জানা যায়।[৫৪] ভারতে আর্যদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রীড়া ক্ষেত্রেও বিভিন্ন নতুন খেলাধুলার প্রচলন ঘটে। আর্যদের মধ্যে মল্লক্রীড়া, রথচালনা, তীরন্দাজি, তরবারি চালনা বা অসিখেলা প্রভৃতি ক্রীড়া প্রচলিত ছিল যা সমগ্র বৈদিক যুগে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। বৈদিক যুগে খেলাধুলা কে শুধুমাত্র আনন্দের মাধ্যম হিসেবে নয়, যুদ্ধের মহড়া হিসেবেও গ্রহণ করা হয়েছিল ফলে মূলত সামরিক পেশার সঙ্গে যুক্ত শাসকগোষ্ঠী বিশেষত ক্ষত্রিয় বর্ণের মানুষেরা ও কিছু সংখ্যক সর্বোচ্চ বর্ণভুক্ত ব্রাহ্মণেরা প্রধানত ক্রীড়া চর্চার সঙ্গে যুক্ত ছিল। দুটি প্রধান মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারতেও শরীরচর্চা এবং খেলাধুলার একাধিক নিদর্শন পাওয়া যায়। দুই মহাকাব্যে ধনুর্বিদ্যা, মল্লযুদ্ধ, যুদ্ধাস্ত্রে পারদর্শিতার উল্লেখ আছে। গুরু দ্রোণাচার্যের ধনুর্বিদ্যা ও যুদ্ধাস্ত্রে পারদর্শিতার কথা সুবিদিত এবং অর্জুনের ধনুর্বিদ্যার নৈপুন্যের একাধিক নিদর্শন মহাভারতে বর্ণিত।[৫৫] ঐতিহাসিক বিল (Beal) তাঁর "The Romantic Legend of Sakya Buddha" গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে গৌতম বুদ্ধের সময়েও সামরিক ও শারীরিক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দান করা হতো এবং বুদ্ধ নিজে সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করে ছিলেন।[৫৬] "কথাসরিৎসাগর" গ্রন্থে অশোক দত্তা নামক এক বিজ্ঞানের ছাত্রের কথা জানা যায় যিনি একইসঙ্গে মুষ্টিযুদ্ধ এবং মল্লযুদ্ধে পারদর্শী ছিলেন।[৫৭]

মধ্যযুগে তুর্ক-আফগানদের ভারতে আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রীড়া ক্ষেত্রেও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীন যুগ থেকে প্রচলিত শিকার, তরবারির যুদ্ধ, তীরন্দাজির মতো ক্রীড়াগুলি অত্যন্ত জনপ্রিয় থাকলেও, এর পাশাপাশি পোলো বা চৌঘান-এর মতো নতুন ক্রীড়ার প্রচলন ঘটে। ভারতের প্রথম সুলতানি শাসক কুতুব-উদ্দিন-আইবক পোলো খেলার সময় ঘোড়ার নীচে পড়ে জীবন হারিয়েছিলেন। আবুল ফজল আইন-ই-আকবরীতে মুঘল দরবারে প্রচলিত একাধিক ক্রীড়ার বর্ণনা দিয়েছেন। একদিকে যেমন এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বিভিন্ন গৃহ মধ্যস্থ ক্রীড়া (Indoor Game) যথা- দাবা, কার্ড খেলা, চৌপার বা

---

৫৪. শিরিন রত্নাগর, *হরপ্পা সভ্যতার সন্ধানে* (কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ২০০৫), ৭২–৭৭, ১০৮–১১২।

৫৫. Sen, *Nation at Play*, 14-17.

৫৬. S. Beal, *The Romantic Legend of Sakya Buddha* (London: Trubner and Co., 1875), 71.

৫৭. C.H. Tawncy, *Somadevas Kathasarit Sagar* (Varanasi: Motilal Banarasidas, 1968), 200.

এক ধরনের লুডো, তেমনই অন্যদিকে এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বিভিন্ন বহিরঙ্গনের ক্রীড়া (Outdoor Game) যথা- শিকার, চৌঘান বা পোলো, ইশকবাজি বা পায়রা ওড়ানো।[৫৮]

ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠা হওয়ার সঙ্গে ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ তথা পশ্চিমী ক্রীড়ার প্রচলন ঘটে। এদেশে আগত ব্রিটিশ তথা ইউরোপীয়রা তাদের মনোরঞ্জন ও অবসর যাপনের জন্য তাদের দেশে প্রচলিত ক্রীড়া গুলিকে এদেশে প্রচলন করে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে গঠিত ইউরোপীয় ক্লাবগুলি মূলত ক্রীড়া কার্যক্রমকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে ক্লাবগুলি ছিল এদেশে আগত ইউরোপীয়দের মেলামেশার স্থান, যেখানে পুস্তক পাঠের ও পানীয়ের ব্যবস্থা থাকত। ঔপনিবেশিকতাবাদের তীব্র বিরোধী ঔপন্যাসিক জর্জ অরওয়েল (George Orwell) ভারতে গড়ে ওঠা ইউরোপীয় ক্লাবগুলি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, "The spiritual citadel, the real seat of the British power."।[৫৯] ভারতে ইংরেজদের দ্বারা প্রচলিত ক্রীড়া গুলি প্রধানত ইংরেজদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং এই সমস্ত ক্রীড়া গুলিকে ভারতে জনপ্রিয় করে তুলতে অথবা ভারতীয়দের ক্রীড়ায় অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করার ব্যাপারে ইংরেজদের কোনো উৎসাহ ছিল না। ভারতে আগত ইংরেজ সরকারি কর্মচারী, সেনাবাহিনী ও অন্যান্য ইউরোপীয়রা নিজেদের বাসভূমির থেকে দূরে বিদেশে নিজেদের বাসভূমির উষ্ণ অনুভূতি ও নৈকট্য লাভ করতে চাইত ক্রীড়ার মাধ্যমে। ইংরেজদের এই ধরনের মানসিকতা সত্বেও ইউরোপীয় ক্রীড়া গুলি ভারতীয়দের মধ্যে প্রচলিত ও জনপ্রিয়তা লাভ করতে থাকে। ভারতে পার্সিরা প্রথম ইউরোপীয় খেলা বিশেষত ক্রিকেটের প্রতি উৎসাহিত হয়েছিল এবং এই ক্রীড়া গুলিকে সংঘটিত করতে ক্লাব গড়ে তুলেছিল। ১৮৪৮ সালে ওরিয়েন্টাল ক্রিকেট ক্লাব (Oriental Cricket Club) ও ১৮৫০ সালে ইয়ং জরাথুষ্টিয়ান ক্লাব (Youg Zoroastrian Club) পার্সিদের দ্বারা গঠিত প্রথম ক্লাব।[৬০] ভারতীয়দের মধ্যে পশ্চিমী ক্রীড়া প্রচলনের বিষয়ে প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল খ্রিস্টান মিশনারি ও তাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলি এবং ইংরেজ পরিচালিত বিদ্যালয় গুলি। এই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ড্রিল, মার্চিং, জিমন্যাস্টিক, ফুটবল, ক্রিকেট ও হকি- এর মতো খেলা গুলির প্রচলন করা হয়। পার্সিদের দ্বারা ক্রিকেট ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অল্প কিছুকাল পরেই এনফিলস্টোন উচ্চ বিদ্যালয় (Elphistone High School)- এর ছাএরা ১৮৬১ থেকে ১৮৭৭ সালের মধ্যে বম্বে ইউনিয়ন ক্রিকেট ক্লাব (Bombay Union Cricket Club) এবং হিন্দু ক্রিকেট ক্লাব (Hindu Cricket Club) গড়ে তোলে। ১৮৭৯ সালে আলীগড় অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজে গঠিত হয় আলীগড় ক্রিকেট ক্লাব (Aligarh Cricket Club) এবং ১৮৯১ সালে বুচি বাবু নাইডু (Buchi Babu Naidu) কর্তৃক গঠিত হয় মাদ্রাস ইউনাইটেড ক্রিকেট ক্লাব (Madras United Cricket Club)। ভারতের পশ্চিম উপকূলে ক্রিকেট

---

৫৮. Sen, *Nation at Play*, 25-26.

৫৯. George Orwell, *Burmese Days* (London: Penguin, 1989), 14.

৬০. Sen, *Nation at Play*, 47.

খেলা জনপ্রিয়তা লাভ করলেও পূর্ব উপকূলে ফুটবল খেলা জনপ্রিয়তা লাভ করে। কলকাতায় গড়ে ওঠা বয়েজ ক্লাব (Boys Club) হল ভারতীয়দের দ্বারা গঠিত প্রথম ফুটবল ক্লাব।[৬১] এছাড়া হকি খেলাও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। তবে শুরুর দিকে পশ্চিমী ক্রীড়া গুলি মূলত ইংরেজ পরিচালিত বিদ্যালয়গুলির ছাত্র তথা অভিজাত বা সমাজের কর্তৃত্বের স্থানাধিকারী মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

ইংরেজরা পশ্চিমী সুঠাম শরীরের বিপরীতে ভারতীয়দের দুর্বল শরীরের এক কল্পিত তত্ত্ব তুলে ধরে নিজেদের জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে সচেষ্ট ছিল। একইভাবে পশ্চিমে ক্রীড়াগুলিতে পারদর্শিতাকে পুরুষোচিত সাহসিকতা ও নৈপুণ্যতা প্রদর্শনের আদর্শ ক্ষেত্র হিসেবে তুলে ধরা হয়েছিল। ইংরেজ শাসনের অধীনে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর সূচনার দিকে যখন ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ ঘটতে থাকে তখন ক্রীড়াও হয়ে ওঠে জাতীয়তাবাদ প্রকাশের একটি ক্ষেত্র। জাতীয়তাবাদের প্রভাবে ব্রিটিশ জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের ধারণার বিরোধিতা করে এবং নিজেদের শারীরিক সক্ষমতা প্রকাশের জন্য ভারতীয়দের মধ্যে শরীর চর্চার প্রবণতা তৈরি হয়। এই সময় যুব সমাজে শরীরচর্চার অধিক প্রবণতা থেকে সমগ্র দেশে গড়ে উঠেছিল অসংখ্য আখড়া। এই আখড়া গুলি হয়ে উঠেছিল একদিকে শরীর চর্চার কেন্দ্র ও অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল। পশ্চিমী ক্রীড়ায় ভারতীয়দের সাফল্য বা ইংরেজদের পরাজিত করে বিজয় লাভ করার ঘটনা হয়ে ওঠে জাতীয়তাবাদীদের কাছে প্রেরণা স্বরূপ এবং জাতীয় দক্ষতার প্রতীক, যেমন- ১৯১১ সালে মোহনবাগান কর্তৃক শীল্ড বিজয়। পরবর্তীকালে দেশ ইংরেজদের পরাধীনতা থেকে মুক্ত হলেও পশ্চিমী খেলা গুলি ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার হিসেবে থেকে যায় এবং ক্রমে এই সমস্ত ক্রীড়াগুলি ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে। যার চূড়ান্ত নিদর্শন ক্রিকেট ও ফুটবলের মত ক্রীড়া গুলির ব্যাপক জনপ্রিয়তা, যা আন্তর্জাতিক ক্রীড়া মঞ্চেও ভারতকে নিজের পরিচয় উজ্জ্বলতর করতে সাহায্য করেছে।

- **চতুর্থ অধ্যায়- জেলা রূপে নদীয়া ও তার ক্রীড়া পরিমণ্ডল:**

ইতিহাস বলতে যেমন আক্ষরিক অর্থে অতীত ঘটনাকে বোঝায় তেমনি অতীত ঘটনাবলী সর্বদা কোনো নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে যেমন- ফরাসি বিপ্লব বলতে আমরা বুঝি ১৭৮৯ সালে ফ্রান্সে সংঘটিত বিপ্লব। সুতরাং ইতিহাসের কোনো বিষয় যথার্থভাবে অনুধাবনের জন্য প্রয়োজন হয় ভূগোল সংক্রান্ত প্রাথমিক জ্ঞানের।[৬২] নদীয়া জেলা সম্পর্কিত যে কোন আলোচনার পূর্বে আমাদের নদীয়া

---

৬১. Ibid., 51.

৬২. E. Sreedharan, *A Manual of Historical Research Methodology* (Kerala: Oriental Black Swan, 2017), 27.

জেলার অতীত ইতিহাস সম্পর্কে জানতে হবে। নদীয়া জেলার নামের উৎপত্তি হয়েছে নবদ্বীপ থেকে যা প্রকৃতপক্ষে জেলার অন্তর্গত এক সুপ্রাচীন নগর যা ভাগীরথী নদীর তীরে অবস্থিত। বঙ্গের সেন বংশীয় রাজা লক্ষণ সেনের রাজত্বকালে উমাপতি ধর রচিত দেওপাড়া প্রশস্তি[৬৩] থেকে জানা যায় যে সেন বংশের শাসক সামন্ত সেন গঙ্গা তীরবর্তী নবদ্বীপ শহরে বসবাসের জন্য প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন।[৬৪] হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতানুসারে সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা সামন্ত সেন তার আদিম নিবাস কর্নাটকে একাধিক যুদ্ধে পরাজিত হয়ে সেখান থেকে পলায়ন করে বঙ্গে আসেন এবং ভাগীরথী তীরবর্তী একটি ছোট অঞ্চলে নিজ কর্তৃত্ব স্থাপন করে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন, যা সম্ভবত প্রাচীন নবদ্বীপ।[৬৫] পরবর্তী সেন রাজা বল্লাল সেন নবদ্বীপে বিশাল প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন যার ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্তমান। সেন বংশের রাজধানী স্থাপনের কারণে নবদ্বীপ একটি রাজনৈতিক কেন্দ্র হিসেবে বিকাশ লাভ করলেও সেন বংশের রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতার কারণে শহরটি ক্রমশ ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রীয় জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র হিসেবে এবং ভাগীরথীর তীরবর্তী হওয়ার কারণে ধর্মীয় তীর্থস্থান হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে। সেন বংশের শাসক লক্ষণ সেন (১১৫৯ – ১২০৬), যখন তার একাধিক রাজধানীর মধ্যে অন্যতম নবদ্বীপে অবস্থান করছিলেন তখন মুসলিম বিজেতা মহম্মদ বখতিয়ার খলজির আকস্মিক আক্রমণের কারণে নদীয়া ছাড়তে বাধ্য হন (১২০৩ সাল)[৬৬] এবং এইভাবে নদীয়া তথা বঙ্গে মুসলিম শাসনের সূচনা হয়।[৬৭] মুসলিম বিজয়ের পর নদীয়া জেলার ইতিহাস বিশেষ জানা যায় না কিন্তু মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর (১৪৮৬ – ১৫৩৩) পুনরায় ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণব সাহিত্যে নবদ্বীপের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৬৮]

---

৬৩. মেটকাফ (C.T. Metcalf) ১৮৬৫ সালে বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্গত রাজশাহী জেলার দেওপাড়া নামক গ্রামের সন্নিকট থেকে লেখটি আবিষ্কার করেন।

৬৪. Nani Gopal Majumdar, *Inscription in Bengal*, (Rajshahi Bangladesh: The Varendra Research Society, 1929), 44-47.

৬৫. Harprasad Shastri, *School History of India* (Calcutta: Calcutta Sanskrit Press Depository, 1899), 35.

৬৬. মিনহাজ উস সিরাজ, "তবাকত-ই-নাসিরী" গ্রন্থে বক্তিয়ার খলজির 'নৌদিয়া' বিজয়ের বর্ণনা দিয়েছেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়- এর মতে এই 'নৌদিয়া' রাজশাহী জেলার অন্তর্গত শহর যা গৌড় শহরের কুড়ি মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। অন্যদিকে অনিরুদ্ধ রায়ের মতে এই 'নৌদিয়া' ও বর্তমান নবদ্বীপ অভিন্ন স্থান।

৬৭. অনিরুদ্ধ রায়, *মধ্যযুগের ভারতীয় শহর* (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৮), ১৩০-১৩৩।

৬৮. তদেব, ১৫৮।

মুঘল শাসন পর্বে নদীয়া জেলা যশোর ফৌজদারির অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৬৯] মুঘল সেনাপতি মানসিংহ কে বাংলা বিজয়ে সাহায্য করার পুরস্কার স্বরূপ ভবানন্দ মজুমদারকে নদীয়া ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জমিদার নিযুক্ত করা হয় মুঘল বাদশাহ কর্তৃক ১৬০৬ সালে এবং এইভাবে স্বাধীন জমিদারি হিসাবে নদীয়া একটি শহরের পরিবর্তে একটি বৃহত্তর অঞ্চল হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। জমিদার নিযুক্ত হওয়ার পর ভবানন্দ মজুমদার তার রাজধানী বাগওয়ান থেকে মাটিয়ারিতে স্থানান্তরিত করেন। পরবর্তীকালে ভবানন্দ মজুমদারের উত্তরাধিকারী রাঘব কর্তৃক রাজধানী রেউ-তে স্থানান্তরিত হয় এবং এর নতুন নামকরণ করা হয় কৃষ্ণনগর যা বর্তমানেও নদীয়া জেলার সদর শহর। ১৭২৮ সালে নদীয়া রাজ হিসেবে পরিচিত রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় নদীয়ার সিংহাসনে বসেন। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে তিনি বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিপরীতে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পক্ষ অবলম্বন করেন। ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে বহুবার নদীয়া জেলার আকৃতির পরিবর্তন ঘটানো হয়। ঔপনিবেশিক পর্বে নদীয়া জেলা প্রেসিডেন্সি বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং একটি জেলা হিসেবে এটি গড়ে ওঠে ১৭৮৭ সালে। ঔপনিবেশিক শাসন পর্বে একাধিকবার প্রশাসনিক এলাকা পুনর্গঠনের জন্য ১৭৭২ সালে রেনেল সাহেবের মানচিত্রে যে বৃহত্তর অঞ্চল জুড়ে নদীয়া কে চিহ্নিত করা হয়েছে, তা পরবর্তীতে বহুলাংশ সংকুচিত হয়। এই সমস্ত যাবতীয় পরিবর্তন সত্ত্বেও মোটের উপর ঔপনিবেশিক পর্বে নদীয়া জেলা ৫টি মহকুমা নিয়ে গঠিত ছিল যথা- কৃষ্ণনগর, রানাঘাট, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা ও কুষ্টিয়া।[৭০]

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ লাইন অনুসারে নদীয়া জেলা দ্বিখন্ডিত হয়। জেলার পাঁচটি মহকুমার মধ্যে মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা ও কুষ্টিয়া এই তিনটি মহকুমার অধিকাংশ অঞ্চল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান বর্তমানে বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং কৃষ্ণনগর ও রানাঘাট মহকুমা তার অধিকাংশ অঞ্চল সহ ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত হয়।[৭১] বর্তমানেও জেলার এই আকৃতি প্রায় অপরিবর্তিত। নদীয়া জেলার উত্তর-পশ্চিম দিকে মুর্শিদাবাদ জেলা, দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বর্তমান বাংলাদেশের যশোর জেলা, উত্তরে বর্ধমান ও হুগলি জেলা এবং দক্ষিণে ২৪ পরগনা জেলা অবস্থিত। ঊনবিংশ শতকের শেষ ও বিংশ শতকের সূচনায় জেলায় পাশ্চাত্য খেলাধুলার প্রচলন ঘটে।

- **পঞ্চম অধ্যায়- নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা বা নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের ইতিহাস:**

নদীয়া জেলার ক্রীড়া ইতিহাস আলোচনা করতে হলে প্রথমেই জেলার সমস্ত ক্রীড়া সংগঠনের তত্ত্বাবধায়ক ও নিয়ন্ত্রক হিসেবে জেলার সর্বোচ্চ ক্রীড়া সংস্থা নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন

---

৬৯. J.H.E. Garrett, *Bengal District Gazetters: Nadia* (Calcutta: The Bengal Secretariat Book Depot., 1910), 34.

৭০. Ibid., 37-38.

৭১. Durgadas Majumdar, *Nadia District Gazetter* (Calcutta: Information and Public Relation Department, 1978), 1-5.

(Nadia District Sport Association- N.D.S.A)- এর কথা উল্লেখ করতে হয়। জেলার প্রধান এই ক্রীড়া সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয় ঔপনিবেশিক শাসকবর্গ কর্তৃক ১৯৩৭ সালে। প্রতিষ্ঠার সময় এই সংগঠনের নাম ছিল নদীয়া স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন (Nadia Sporting Association)। প্রতিষ্ঠার সময় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন যথাক্রমে পদাধিকার বলে নদীয়া জেলার তৎকালীন জেলা শাসক I.C.S এম.এম. স্টিওয়ার্ট (M.M. Stewart) এবং তৎকালীন কৃষ্ণনগর পৌরসভার পৌরপিতা সুধীন্দ্র চন্দ্র মল্লিক। ঔপনিবেশিক শাসকবর্গ কর্তৃক এই সংগঠন গড়ে তোলার পশ্চাতে ভারতের যুব সমাজকে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে রাখার ঔপনিবেশিক উদ্দেশ্য কাজ করেছিল। এই সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যাবতীয় খেলাধুলা সংক্রান্ত কার্য পরিচালনার জন্য কৃষ্ণনগরে খেলার মাঠ পাঁচ বছরের মেয়াদে ভাড়া নেওয়া হয় এবং এই সংগঠনের তত্ত্বাবধানে ১৯৩৮ সালে নদীয়া জেলায় প্রথম শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় কৃষ্ণনগরে সরকারি মহাবিদ্যালয়ের মাঠে। ওই একই বছর সংগঠন সেই সময় পর্বে কলকাতায় অনুষ্ঠিত একমাত্র ক্রিকেট প্রতিযোগিতা হিসেবে কুচবিহার কাপে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সংগঠনের কাজের ক্ষেত্রে প্রতিকূল হয়ে ওঠে। এই সময় পর্বে সংগঠন প্রায় নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, এমনকি পূর্বে সংগঠনের ক্রীড়া সংক্রান্ত কার্য সম্পাদনের জন্য যে খেলার মাঠ ভাড়া নেওয়া হয়েছিল তার চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও তা পুনরায় নবীকরণ করা হয়নি। স্বাধীনতা লাভের পর এই সংগঠনের পুনর্জীবন ঘটে স্বাধীন দেশের স্বাধীন সরকারের অধীনে। ১৯৪৮ সালে সংগঠনকে পুনরুজ্জীবিত করা হয় এবং এর নতুন নামকরণ করা হয় নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন (Nadia District Sporting Association)। এরপর ১৯৫২ সালের সংগঠনের নাম পুনরায় পরিবর্তিত হয় এবং এর নতুন নামকরণ করা হয় নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন (Nadia District Sport Association), যে নাম বর্তমানেও একই রয়ে গেছে। ওই একই বছর সংস্থার নিয়মসংহিতা রচিত ও গৃহীত হয়। এই পর্বে জেলা ক্রীড়া সংগঠন প্রথমে ইণ্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (Indian Football Association, I.F.A) ও তার পরবর্তীতে ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (Cricket Association of Bengal, C.A.B)- এর দ্বারা অনুমোদন লাভ করে। প্রতিষ্ঠার সময় থেকে এই সংগঠনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নিজস্ব একটি খেলার ময়দান ও সেই ময়দানকে কেন্দ্র করে স্টেডিয়াম স্থাপন। ১৯৬৫ সালে সংস্থা কৃষ্ণনগরের টাউন ক্লাবের মালিকানা থেকে খেলার মাঠ যা পূর্বে সংগঠন ভাড়া নিয়ে নিজের খেলাধুলা সংক্রান্ত কার্যে ব্যবহার করত তা নিজে মালিকানাতে আনতে সক্ষম হয়। এই খেলার মাঠে স্টেডিয়াম নির্মাণের অনুমতির জন্য ওই বছরই স্টেট কাউনসিল অফ স্পোর্টস (State Council of Sports)- এর কাছে আবেদন করা হলে তা গৃহীত হয়। কিন্তু ১৯৬৬ সালে ভারত-পাক যুদ্ধ শুরু হলে সরকার কর্তৃক আর্থিক অনুদান না পাওয়ার জন্য এই নির্মাণ কার্য ব্যাহত হয়। এই দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ক্রীড়া ক্ষেত্র কখনোই সমাজ বহির্ভূত বিষয় নয়, দেশ-সমাজের বিভিন্ন ঘটনা ক্রীড়া ক্ষেত্রকেও ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে, এমনকি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও তার প্রভাব অনুভূত হয়। সরকারি অনুদানের অভাবে সংস্থা স্থানীয় পর্যায়ে নিজস্ব উদ্যোগে অর্থ সংগ্রহ করতে সচেষ্ট হয়। এই প্রয়াসের ফলস্বরূপ ১৯৬৭ সালের ২৩শে জানুয়ারি স্টেডিয়ামের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় এবং সংস্থার নিজস্ব অর্থে স্টেডিয়ামের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। স্টেডিয়ামের নির্মাণ কার্য শুরু হলে

১৯৬৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৫০০০০ টাকা অনুদান প্রদান করে নির্মাণ কার্য সম্পাদনের জন্য। এছাড়াও সরকারের তরফ থেকে বিভিন্ন সময় স্টেডিয়ামের কলেবর বৃদ্ধির জন্য আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়, যার চূড়ান্ত রূপ হল বর্তমানে সংগঠনের স্টেডিয়াম।[৭২] ১০ই জুন ২০১৫ সালে এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নবকলেবরে সজ্জিত স্টেডিয়ামের উদ্বোধন করে এর নতুন নামকরণ করা হয় কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত সাহিত্যিক দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নামানুসারে ডি.এল.রায় মেমোরিয়াল ডিস্ট্রিক্ট স্টেডিয়াম (D.L. Roy Memorial District Stadium)।

স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতের গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক আদর্শের প্রতিফলন লক্ষ করা যায় জেলা ক্রীড়া সংস্থার নিয়ম সংহিতায়। সংস্থার নিয়ম সংহিতা প্রথম গৃহীত হয় ১৯৪৮ সালে কিন্তু এই নিয়ম সংহিতায় সংস্থার বিভিন্ন পদাধিকারী নির্বাচন ও বিভিন্ন কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে উপযুক্ত গণতান্ত্রিক আদর্শ প্রতিফলিত হয়নি, যার চূড়ান্ত নিদর্শন হল সংগঠন কর্তৃক স্বীকৃত ক্লাবগুলির সকলের নির্বাচনে ভোটদানের অধিকার না থাকা। নিয়ম সংহিতার গণতান্ত্রিকরণের জন্য জেলার ক্রীড়া ক্লাব গুলি বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং নিজেদের পৃথক ফেডারেশন গঠন করলে জেলার ক্রীড়া ক্ষেত্রে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত এন.ডি.এস.এ বিদ্রোহী ক্লাব গুলির দাবি মেনে নিয়ে ১৯৫২ ও ১৯৫৪ সালে নিয়ম সংহিতায় সংশোধন করলে বিদ্রোহী ক্লাবগুলি নিজেদের পৃথক সংগঠনের অবলুপ্তি ঘটায়। নতুন নিয়ম সংহিতা অনুসারে অনুমোদিত ক্রীড়া ক্লাবগুলি জেলা সংগঠনে তাদের প্রতিনিধি প্রেরণ ও সংগঠনের গভর্নিং বডি সহ সমস্ত কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে ভোট দানের অধিকার লাভ করে। সংগঠনের নিয়ম সংহিতার গণতান্ত্রিকরণের এই আন্দোলন সদ্য স্বাধীনতা লাভ করা দেশের জনগণের মধ্যে সঞ্চারিত অধিকারবোধ ও গণতান্ত্রিক সচেতনতার দ্যোতক। একইভাবে নিয়ম সংহিতায় সংগঠনের অনুমোদন প্রাপ্ত ক্রীড়া ক্লাবের সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, ক্লাবকে অবশ্যই ক্রীড়া অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে এবং এই খেলাধুলায় অংশগ্রহণ হতে হবে মুক্ত অর্থাৎ জাতি, ধর্ম, বর্ণ বা পেশার ভিত্তিতে কাউকে অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত করা যাবে না, যা বহুলাংশে ভারতীয় সংবিধানের সাম্যের আদর্শকে তুলে ধরে।[৭৩]

জেলা ক্রীড়া সংস্থা সামাজিক সচেতনতার পরিচয় স্টেডিয়াম গঠিত হওয়ার অল্প কিছু সময়ের মধ্যেই প্রদান করে, যখন ১৯৬৮ সালের ৩রা নভেম্বর কৃষ্ণনগর স্টেডিয়ামে কলকাতার প্রথম বিভাগের দুটি দল- এরিয়ান্স ক্লাব ও বাটা স্পোর্টস ক্লাবের মধ্যে প্রদর্শনী ফুটবল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রদর্শনী ফুটবল অনুষ্ঠিত হওয়ার পশ্চাতে প্রধান উদ্দেশ্য ছিল টিকিট বিক্রির মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থে উত্তরবঙ্গের বন্যা দুর্গতদের সাহায্য দান। নর্থ ক্যালকাটা কলেজ- এর সাহায্যার্থে ১৯৬৯ সালে ৪ঠা মে ইস্টবেঙ্গল ও এরিয়ান্স ক্লাবের মধ্যে

---

৭২. Jayanta Chatterjee, ed., *Nadia District Sports Association, Amended Constitution Book* (Krishnagar: Nadia District Sports Association, 2017), I-V.

৭৩. Ibid., 6.

প্রদর্শনী খেলা অনুষ্ঠিত হয়। টোকিও অলিম্পিকে জিমন্যাস্টিক বিভাগে ভারতের প্রতিনিধিত্বকারী নদীয়া জেলার বেথুয়াডহরীর অধিবাসী দেবাশীষ মন্ডলের অকাল প্রয়াণ ঘটলে, তার পরিবারবর্গকে সাহায্যের জন্য সংস্থা মোহনবাগান ও আই.এফ.এ-এর সভাপতি একাদশের মধ্যে প্রদর্শনী খেলার আয়োজন করে, যার মাধ্যমে লব্ধ অর্থ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। বন্যা দুর্গতদের সাহাযার্থে ১৯৭৮ সালের ২৬শে নভেম্বর নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা মুখ্যমন্ত্রীর বন্যা ত্রাণ তহবিলে ৫০০০১ টাকা প্রদান করে। উড়িষ্যার কালাহান্ডি-তে খরা পীড়িত জনগণকে সাহায্য দানের উদ্দেশ্য নিয়ে পূর্ব যাদবপুর আন্তঃসংঘ সম্মিলনী ও ফ্রেন্ডস অফ দ্যা স্টেডিয়াম বিভিন্ন সাব-জুনিয়র ফুটবল দল সমূহ কে নিয়ে ১৯৮৭ সালের ১৯শে জুন থেকে ২৮শে জুন পর্যন্ত বিস্তৃত ক্রীড়া সূচি সম্পন্ন 'জুনিয়র ফ্রেন্ডশিপ ট্রফি' নামে একটি লীগ কাম নকআউট ভিত্তিক ফুটবল প্রতিযোগিতা আয়োজন করলে, এই প্রতিযোগিতার খেলাগুলি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে আয়োজনের ব্যবস্থা করা হয়। এই মহৎ উদ্দেশ্য সমন্বিত প্রতিযোগিতার খেলা ১৯শে জুন ১৯৮৭ সালে কৃষ্ণনগরে আয়োজিত হলে (ত্রিপুরা রাজ্য একাদশ বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ক্রীড়া সংস্থা একাদশ), এই খেলার যাবতীয় ব্যবস্থাপনা ও ব্যয়ভার বহন করে নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা নিজেদের অবদান রাখে। ২০০৩ সালের ২৩শে জানুয়ারি জেলা স্টেডিয়ামের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় এবং সংস্থা তার অধীনস্থ আঞ্চলিক সংস্থা ও অনুমোদিত ক্লাবগুলিকে রক্তদান শিবির আয়োজন এর জন্য অনুরোধ করে। এই অনুরোধে সারা দিয়ে একাধিক ক্লাব ও আঞ্চলিক সংস্থা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে এবং ২০০৯ সালের পর থেকে জেলা সংস্থা প্রতিবছর ৩রা ফেব্রুয়ারি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে আসছে জেলা স্টেডিয়ামে। সমাজে সমস্ত দিক থেকে অনগ্রসর আদিবাসী সম্প্রদায় যাতে ক্রীড়া ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ ও নিজেদের কুশলতা প্রদর্শন করে ক্রীড়া ক্ষেত্রে উজ্জ্বল উপস্থিতি তুলে ধরতে পারে, এই মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আই.এফ.এ- এর পরিচালনায় ২০০৯ সালে আদিবাসী ফুটবল লীগ আয়োজন করার উদ্যোগ নেওয়া হলে, জেলা ক্রীড়া সংস্থা তাতে সাড়া দিয়ে খেলা আয়োজন করতে উদ্যোগী হয়। ২০০৯ সালের ২৬ থেকে ৩১শে মার্চ জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় চাকদহ নেতাজি সুভাষ স্টেডিয়ামে জেলা পর্যায়ের আদিবাসী ফুটবল লীগের প্রথম বর্ষের খেলা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে জেলার চারটি আদিবাসী খেলোয়াড়দের নিয়ে গঠিত দল এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। উপরোক্ত বর্ণনা একদিকে যেমন জেলা ক্রীড়া সংস্থার সমাজ সচেতনতা ও সামাজিক দায়িত্ব পালনে তাদের তৎপরতার চিহ্ন বহন করে, তেমনি অন্যদিকে ক্রীড়া ক্ষেত্র ও সমাজের মধ্যে যে গভীর যোগসূত্র বর্তমান তাও তুলে ধরে।

দেশভাগ ও তার পরবর্তী উদ্বাস্তু সমস্যা স্বাধীনতা পরবর্তী সমাজে নিয়ে এসেছিল নতুন সামাজিক দ্বন্দ্ব। যারা প্রায় সর্বহারা হয়ে পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে এসেছিল তাদের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের আদি অধিবাসীদের নানা আর্থসামাজিক কারণে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে, আর ক্রীড়া ক্ষেত্রে এই দ্বন্দ্বের সার্থক প্রতিফলক হয়ে ওঠে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল ফুটবল ক্লাবের মধ্যে প্রতিযোগিতা। যদিও এক্ষেত্রে সহযোগিতার দৃষ্টান্তও প্রচুর পাওয়া যায়। যার এক উজ্জ্বল উদাহরণ ক্রীড়া ক্ষেত্রে স্থাপন করেছে নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা। ১৯৭১ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ পশ্চিম পাকিস্তানের সর্বগ্রাসী আগ্রাসনের ও আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে স্বাধীনতার দাবিতে। স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনই ছিল এই পর্বে প্রধান লক্ষ্য। স্বাধীনতা ও দেশভাগের পর থেকেই বহু শরণার্থী পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে থাকেন। নদীয়া

সীমান্তবর্তী জেলা হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই এখানে শরণার্থী আগমন বহু সংখ্যায় ঘটে। পশ্চিমবঙ্গের জনগণ স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী জনগণের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ছিল। পশ্চিমবঙ্গের মানুষজন বিভিন্ন উপায়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করতে উদ্যোগী হয়েছিল। এক্ষেত্রে খেলার মাঠ হয়ে উঠেছিল এক মাধ্যম। পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় গ্রহণকারী মুক্তি যোদ্ধারা তাদের নব উত্থিত জাতীয়তাবাদ প্রকাশের সফল সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র এবং বিশ্বের দরবারে তাদের মুক্তিযুদ্ধকে পৌঁছে দেওয়ার ও বিশ্ব সমর্থন লাভের একটি মাধ্যম হিসেবে খেলার মাঠ বিশেষত ফুটবল-কে গ্রহণ করেছিল। পূর্ব পাকিস্তানের বহু বাঙালি খেলোয়াড় মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং অনেকে পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে আসেন ও কলকাতায় গঠিত স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের সমর্থনে হাত মেলান। পশ্চিমবঙ্গে আগত বেশ কিছু পূর্ব পাকিস্তানের ফুটবল খেলোয়াড় 'বাংলাদেশ ক্রীড়া সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন। এই ক্রীড়া সমিতি স্থির করে যে তারা বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শনী খেলায় অংশগ্রহণ করবে। এই প্রদর্শনী খেলার পশ্চাতে দুটি উদ্দেশ্য কাজ করেছিল প্রথমত, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে প্রচার ও দ্বিতীয়ত, প্রদর্শনী খেলার মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থে মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য দান। জাকারিয়া পিন্টুর নেতৃত্বে গঠিত বাংলা ফুটবল দল ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে মোট ১৬ টি প্রদর্শনী খেলায় অংশগ্রহণ করে।

বাংলা দলের প্রথম খেলাটি অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭১ সালের ২৫শে জুলাই কৃষ্ণনগর স্টেডিয়ামে নদীয়া একাদশের বিরুদ্ধে। এই খেলার প্রবেশ মূল্য হিসেবে টিকিটের দাম ৫০ পয়সা ধার্য করা হয় এবং লব্ধ অর্থ সমস্তটাই বাংলাদেশের সরকারের হাতে মুক্তিযুদ্ধের সাহায্যার্থে প্রদান করা হবে বলে স্থির হয়। যাতে সর্বোচ্চ পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করা যায় সেই উদ্দেশ্যে উক্ত প্রদর্শনী খেলায় সর্বপ্রকার ফ্রি-পাশের ব্যবস্থা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় জেলা ক্রীড়া সংস্থার তরফ থেকে। খেলাটির প্রচারে বাংলাদেশের ফুটবল দলের খেলোয়াড়দের ছবিসহ পোস্টার দেওয়ার ফলে প্রদর্শনী খেলাটাকে কেন্দ্র করে জনমানসে আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। স্বাধীন বাংলাদেশ রেডিওতে খেলার খবর প্রচার করা হলে নদীয়ার পার্শ্ববর্তী কুষ্টিয়া থেকেও বহু মানুষের সমাগম ঘটে খেলার মাঠে।[৭৪] ২৫শে জুলাই সংঘঠিত এই খেলায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের বেশ কিছু পদস্থ ব্যক্তি এবং বাংলাদেশের মুক্তিফৌজের জনৈক্য উচ্চ পর্যায়ের রণনায়ক। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন নদীয়ার জেলাশাসক, পুলিশ সুপার সহ জেলার অন্য অনেক পদস্থ আধিকারিক। খেলার পূর্বে বাংলাদেশ দল সিদ্ধান্ত নেয় যে তারা স্বদেশের পতাকা নিয়ে স্টেডিয়াম প্রদক্ষিণ করবে এবং ওই পতাকা উত্তোলন করা হবে। ভারত সরকার কর্তৃক তখনও পর্যন্ত নির্বাসনে গঠিত বাংলাদেশ সরকারকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি না দেওয়ায়, এই দাবিকে কেন্দ্র করে জটিলতা দানাবাঁধে। শেষ পর্যন্ত নদীয়ার জেলা শাসক নিজ দায়িত্বে পতাকা উত্তোলনের অনুমতি দিলে জেলা ক্রীড়া সংস্থা তা মেনে নেয় এবং খেলা শুরুর পূর্বে উভয় দলের পতাকা উত্তোলন করা হয়। এই প্রদর্শনী খেলা উপলক্ষ্যে জেলা স্টেডিয়ামে প্রায় ৮ হাজার দর্শকের সমাগম ঘটে ও দর্শকদের মধ্যে উদ্দীপনা ছিল বিশেষ উল্লেখ্য। উভয় দলের খেলোয়াড় সুন্দর ক্রীড়া কীর্তির পরিচয়

---

৭৪. সালেক সুফী, "মুক্তিযুদ্ধের ফুটবল ফ্রন্ট," *খেলার কথা কথার খেলা*, সম্পা. ইকরামউজ্জামান ও অন্যান্য (ঢাকা, ১৯৯৩), ৩৭।

রাখেন, তবে খেলাটি শেষ পর্যন্ত ২-২ গোলে অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়। প্রদর্শনী খেলা সফলতার সাথে সম্পাদিত হলেও যেহেতু ভারত সরকার তখনও পর্যন্ত অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারকে আনুষ্ঠানিক অনুমোদন প্রদান করেনি, তাই খেলার পূর্বে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনের জন্য শাস্তি স্বরূপ নদীয়ার জেলাশাসককে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয় এবং জেলা ক্রীড়া সংস্থার স্বীকৃতিও বাতিল করা হয়। এরপর অবশ্য ভারত সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি প্রদান করা হলে জেলা শাসক কে পুনর্বহাল করা হয় এবং জেলা ক্রীড়া সংস্থার স্বীকৃতিও ফিরিয়ে দেওয়া হয়।[৭৫]

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকে নদীয়া ও বাংলাদেশের মধ্যে ক্রীড়া ক্ষেত্রে যে সখ্যতা স্থাপিত হয়েছিল, তা বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পরও বজায় থাকে। স্বাধীনতা লাভের পর প্রথম ১৯৭২ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি নদীয়া জেলা দল ও বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলা দলের মধ্যে কৃষ্ণনগর জেলা স্টেডিয়ামে একটি প্রদর্শনী ভলিবল খেলা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে নদীয়া জেলা দল জয়লাভ করে। ১৯৭২ সালের ২৬শে মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার প্রথম বার্ষিকী হিসেবে আয়োজিত স্বাধীনতা উৎসবের অনুষ্ঠানের মধ্যে একটি ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হলে, উক্ত প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্য বাংলাদেশের স্পোর্টস কন্ট্রোল বোর্ড (Sports Control Board) নদীয়া জেলা দলকে আমন্ত্রণ জানালে জেলা ক্রীড়া সংস্থার তরফ থেকে তা গৃহীত হয়। ৭, ৮ ও ১০ই এপ্রিল ঢাকা ফুটবল লিগ বিজয়ী বাংলাদেশ ইনডাসট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (বি.আই.ডি.সি)- এর সঙ্গে নদীয়া জেলা ফুটবল দলের খেলা হয় এবং প্রথম দুটি খেলা অমীমাংসিত থাকলেও, তৃতীয় খেলায় নদীয়া দল পরাজিত হয়, যদিও নদীয়া দলের খেলা বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়। ১৯৮২ সালে ভারত পরিক্রমারত বাংলাদেশের জাতীয় জুনিয়র ফুটবল চ্যাম্পিয়ন নারায়ণগঞ্জ মহকুমা ফুটবল দল ১৯শে অক্টোবর নদীয়া জেলা জুনিয়র একাদশের বিরুদ্ধে প্রীতি ফুটবল খেলায় মিলিত হয়। ১৯৮৪ সালের ১০ই মার্চ জেলা স্টেডিয়ামে বাংলাদেশের রাজশাহী ফুটবল দল ও নদীয়া জেলা একাদশের মধ্যে প্রীতি ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর বাংলাদেশ ক্রিকেট খেলার উন্নতি ও প্রসারের উদ্যোগ নিলে নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা এক্ষেত্রেও ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল- এর আনুকূল্যে জেলা স্টেডিয়ামে বাংলাদেশের ক্রিকেট দল ও নদীয়া জেলা একাদশের মধ্যে চল্লিশ ওভারের সীমিত একদিনের খেলা আয়োজন করে ১৯৮৩ সালের ১৮ই ডিসেম্বর। এছাড়াও বাংলাদেশ ক্রিকেট দল ২০০৭ সালে ও ২০১২ সালে জেলা স্টেডিয়ামে ক্রিকেট খেলায় অংশগ্রহণ করে। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে কূটনৈতিক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক যার সূচনা হয়েছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার অনেক পূর্বে মুক্তিযুদ্ধের সময়, সে ক্ষেত্রে খেলার মাঠ হয়ে উঠেছে এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা এই কূটনৈতিক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে নিজের ভূমিকা অত্যন্ত সদর্থক ভাবে পালন করেছে। ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা লাভের সময় নদীয়াও দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল এবং এর বৃহত্তর অংশ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ায়, সেখানকার বাঙ্গালীদের

---

৭৫. *নদীয়া ডিস্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১লা আগস্ট, ১৯৭১, ২।

প্রতি আন্তরিক আকর্ষণও সম্ভবত স্বাধীনতার আগে ও পরে ক্রীড়া ক্ষেত্রে প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করতে উৎসাহিত করেছিল জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে। যার ফলে জেলা ক্রীড়া সংস্থাও বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্রীড়া দলের প্রদর্শনী খেলা আয়োজন করতে তৎপর হয়েছে এবং অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে তা সম্পাদন করেছে।[৭৬]

নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা তার প্রধান কাজ অর্থাৎ জেলার ক্রীড়া প্রসারের ব্যাপারেও সর্বদা সচেষ্ট থেকেছে। জেলা ক্রীড়া সংস্থা দ্বি-বিধ উদ্দেশ্য নিয়ে বিভিন্ন ঐতিহ্যশালী ও সুনাম সম্পন্ন প্রতিযোগিতা এবং কলকাতার বিখ্যাত ও শক্তিশালী ক্লাবগুলির খেলা জেলা স্টেডিয়ামে আয়োজন করে এসেছে। প্রথম যে উদ্দেশ্য কাজ করেছিল তা হল জেলা ক্রীড়া প্রেমী মানুষদের ভালো ক্লাবের খেলা দেখার সুযোগ করে দেওয়া ও সেই খেলার টিকিট বিক্রির মাধ্যমে সংস্থার আর্থিক পরিস্থিতি মজবুত করা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি ছিল এই সমস্ত খেলা আয়োজনের মাধ্যমে বৃহৎ খেলা আয়োজনের সাংগঠনিক জ্ঞান লাভ করা ও উন্নত ক্রীড়া পারদর্শিতা প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে নিজেদের ক্রীড়ার মান উন্নয়ন। কলকাতার প্রধান তিনটি ক্লাব মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল ও মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ১৯৬৭ সালে জেলা স্টেডিয়াম প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর একাধিক বার জেলা স্টেডিয়ামে বিভিন্ন প্রদর্শনী খেলায় অংশ নিয়েছে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত। ১৯৯১ সালের ৯ই জুন নবদ্বীপের পি.এস.সি মাঠে ক্লাবের রজতজয়ন্তী বর্ষ উদযাপনের অন্যতম অঙ্গ হিসেবে নবদ্বীপের আজাদ হিন্দ ক্লাব আয়োজন করে এক প্রদর্শনী ফুটবল যেখানে অংশগ্রহণ করে নদীয়া জেলা একাদশ ও ইস্টবেঙ্গল দল, কলকাতার প্রধান ত্রয়ীর অন্যতম ইস্টবেঙ্গলকে নদীয়া জেলা একাদশ এক গোলের ব্যবধানে পরাজিত করে। ১৯৯১ সালের পর ফুটবলে কলকাতার বৃহৎ ক্লাবগুলির জেলাতে প্রদর্শনী খেলায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে অনীহা বৃদ্ধি পায়। এরপর পুনরায় ২০০৭ সালে ২৭শে জুলাই জেলা স্টেডিয়ামে ইস্টবেঙ্গল ও নদীয়া জেলা একাদশের মধ্যে প্রদর্শনী খেলা আয়োজিত হয়। দীর্ঘদিন পরে কলকাতার তিন প্রধান ক্লাবের একটি জেলা স্টেডিয়ামে খেলতে এলে জনমানসে ব্যাপক উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এবং প্রবল বৃষ্টিপাত সত্ত্বেও স্টেডিয়ামের দর্শকে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। যদিও এরপর বৃহৎ ক্লাব গুলি জেলায় খেলতে বিশেষ উৎসাহ দেখায়নি। ১৯৭৪ সালে আই.এফ.এ শীল্ড কলকাতা কেন্দ্রিকতা দূর করে বিকেন্দ্রীকরণের নীতি গ্রহণ করলে, নদীয়া জেলা সংস্থা তখন থেকেই জেলা স্টেডিয়ামে খেলা অনুষ্ঠিত করে আসছে। এমনকি এই বিকেন্দ্রীকরণের নীতি কে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে গিয়ে, জেলা সংস্থা জেলার পল্লী অঞ্চলে খেলাকে ছড়িয়ে দিতে উদ্যোগ নিয়ে ১৯৮৪ সালে জেলা স্টেডিয়ামের বাইরে পঞ্চায়েত অঞ্চল হিসেবে তেহট্টে খেলার আয়োজন করে। কিন্তু ১৯৮৪ সালের পরের থেকে পুনরায় আই.এফ.এ শীল্ডের খেলাগুলি কেন্দ্রীয়ভাবে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হতে থাকে। ১৯৮৪ সালের পর পুনরায়

---

৭৬. *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ*।

১৯৯৬ সালে জেলা স্টেডিয়ামে আই.এফ.এ শীল্ডের একটি ক্লাস্টারের খেলা সম্পন্ন হয় যদিও এর পরবর্তীতে এই শীল্ডের খেলা আর জেলায় অনুষ্ঠিত হয়নি।[৭৭]

জেলা ক্রীড়া সংস্থা সর্বদাই বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খেলা গুলিকে জেলা স্টেডিয়ামে আয়োজন করার বিষয়ে তৎপরতা দেখিয়েছে, যার ফল স্বরূপ বাংলাদেশ ছাড়াও দুটি আন্তর্জাতিক মানের ফুটবল দলের খেলা জেলা স্টেডিয়ামে আয়োজন করতে সক্ষম হয়েছে সংস্থা। ১৯৭২ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর সর্বপ্রথম এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতীয় ফুটবল দল ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় দল কোনো জেলা শহরে খেলতে আসে। উক্ত দিনে নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর স্টেডিয়ামে ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় দল ও আই.এফ.এ- এর সম্পাদক একাদশের মধ্যে প্রদর্শনী খেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রদর্শনী খেলার ক্ষেত্রে প্রথম জেলা স্টেডিয়ামে যাতে মহিলারা মাঠে উপস্থিত থেকে এই আন্তর্জাতিক ম্যাচ উপভোগ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা হয়, যা নিঃসন্দেহে খেলার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি তথা বিশেষত মহিলাদের মধ্যে এর প্রসারের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ বলে গণ্য হতে পারে। ভারতে বর্ষব্যাপী রুশ উৎসবের একটি অংশ হিসেবে 'কুজবাসকেমেরোভো' নামক রুশ ফুটবল দলটি পশ্চিমবঙ্গে প্রদর্শনী খেলায় অংশ নিতে এলে, ৬ই নভেম্বর ১৯৮৮ সালে জেলা স্টেডিয়ামে আই.এফ.এ একাদশের সঙ্গে একটি প্রদর্শনী খেলায় অংশগ্রহণ করে। অতিথি দল এই খেলায় ২-০ গোলে জয়লাভ করে।[৭৮]

১৯৮০- এর দশক থেকে জেলা স্টেডিয়ামে খেলার বিষয়ে কলকাতার প্রধান ফুটবল ক্লাব গুলির অনীহা এবং একই সঙ্গে আই.এফ.এ শীল্ডের খেলা গুলি কেন্দ্রীয়ভাবে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হওয়ার ফলে জেলা সংস্থা ক্রমশ ক্রিকেটের গুরুত্বপূর্ণ খেলাগুলিকে আয়োজন করতে উদ্যোগী হয়। ১৯৮১ সালে জেলা স্টেডিয়ামে প্রথম ১৮ - ২০শে ডিসেম্বর বাংলা ও আসামের মধ্যে তিন দিনব্যাপী রঞ্জিট্রফির ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। একইভাবে ১৯৮২ সালে ১০ - ১২ই ডিসেম্বর বিহার ও বাংলার মধ্যে এবং ১৯৯৬ সালে ২১ - ২৫শে জানুয়ারি বাংলা ও আসামের মধ্যে রঞ্জি ট্রফির খেলা জেলা স্টেডিয়ামে আয়োজিত হয়। ২০০৬ সালে সি.কে.নাইডু ট্রফির খেলা বাংলা ও উড়িষ্যার মধ্যে, ২০০৮ সালে একযোগে পাঁচটি সর্বভারতীয় পর্যায়ের কুচবিহার ট্রফির খেলা যেখানে গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, গোয়া, ত্রিপুরা রাজ্য দল ও রেলওয়েজ অংশ নেয়, ২০০৯-১০ সালে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের মর্যাদাপূর্ণ বিজয় মার্চেন্ট ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনাল খেলা যেখানে তামিলনাড়ু ও মুম্বাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, সি.এ.বি পরিচালিত অনূর্ধ্ব ১৬ বৎসর রাজ্য আন্তঃবিদ্যালয় দাত্তু ফাদকার ক্রিকেট প্রতিযোগিতার খেলা জেলা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়।[৭৯]

পাতিয়ালার নেতাজি সুভাষ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব স্পোর্টস- এর উদ্যোগে প্রতিবছর

---

৭৭. *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ*।

৭৮. *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ*।

৭৯. *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ*।

গ্রামের ছেলে মেয়েদের জন্য বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়ে থাকে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে, যেখানে ১৫ বৎসর বয়স্ক গ্রামের অধিবাসী বালক-বালিকারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকারী। ১৯৭৮ সালের জানুয়ারি মাসের ৮ই মে সারা ভারত গ্রামীণ খেলাধুলার তিন নম্বর গ্রুপের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা জেলা স্টেডিয়ামে আয়োজিত হয়। তিন নম্বর গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত খেলা গুলি হল ফুটবল, ভলিবল ও জিমন্যাস্টিক। তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল মাননীয় ত্রিভুবন নারায়ণ সিং অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ১০ই জানুয়ারি, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। এই প্রতিযোগিতায় ১৩ টি রাজ্যের ৪৪২ জন বালক ও ১৫০ জন বালিকা সহ সর্বমোট ৫৯২ জন অংশগ্রহণ করে।[৮০]

নদীয়া জেলার অ্যাথলিট খেলোয়ারদের মধ্যে মহিলা খেলোয়াড়দের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে দৃশ্যমান হলেও দলগত খেলার ক্ষেত্রে মহিলা খেলোয়ারদের অনুপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা সর্বদাই মহিলাদের মধ্যে খেলার সম্প্রসারণের বিষয়ে সচেতনভাবে উদ্যোগ নিয়ে এসেছে। ১৯৭৭ সালের ২৪শে জুলাই জেলা স্টেডিয়ামে কয়েক হাজার দর্শকের সামনে প্রথম মহিলা ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত হয় ভারতের মহিলা ফুটবল দল ও পশ্চিমবঙ্গ মহিলা ফুটবল দলের মধ্যে। জেলা ক্রীড়া সংস্থা ১৯৯০ সালে প্রথম মহিলা ভলিবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। সি.এ.বি কর্তৃক প্রায় সব জেলায় মহিলা ক্রিকেট দল গঠন করতে উদ্যোগ নিতে বলা হলে, নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা তাতে সাড়া দিয়ে মহিলা ক্রিকেট দল গঠন করতে উদ্যোগী হয়। প্রথম আন্তঃজেলা মহিলা ক্রিকেট চ্যাম্পিয়নশিপ নামক সি.এ.বি কর্তৃক আয়োজিত এই প্রতিযোগিতার জন্য জেলা দল গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হলে, খেলোয়াড়দের উৎসাহ দিতে হাজির হন ভারতের মহিলা ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক নদীয়ার বাসিন্দা ঝুলন গোস্বামী। সি.এ.বি পরিচালিত মহিলাদের আন্তঃজেলা ক্রিকেট চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতার ফাইনালে ২০১৭ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর কুচবিহার স্টেডিয়ামে গতবারের চ্যাম্পিয়ন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা দলকে পরাজিত করে নদীয়া মহিলা দল প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন হবার গৌরব অর্জন করে।[৮১]

ক্রীড়া ক্ষেত্রের পাশাপাশি জেলার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও নিজেদের অবদান তুলে ধরতে নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা সর্বদাই সচেষ্ট থেকেছে। খেলার প্রসারের পাশাপাশি যাতে তার ইতিহাসও যথার্থভাবে সংরক্ষিত হয় এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তা ব্যবহার করতে পারে, এই ধরনের সাংস্কৃতিক উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে সংস্থা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। সংগঠন শুধুমাত্র খেলাধুলা বিষয়ক একটি স্পোর্টস লাইব্রেরি গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়ে ২৬শে জানুয়ারি ১৯৭৩ সালে লাইব্রেরির উদ্বোধন করে। এই ধরনের উদ্যোগ সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এক অনন্য পদক্ষেপ কারণ এই ধরনের স্পোর্টস লাইবেরি পশ্চিমবাংলায় একটিও ছিল না

---

৮০. *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ*।

৮১. *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ*।

অর্থাৎ এটি পশ্চিমবাংলার প্রথম স্পোর্টস লাইব্রেরি। জেলা সংস্থা আর্থিক দিক থেকে স্বচ্ছলতা লাভের জন্য সংগঠন কর্তৃক প্রকাশিত পাক্ষিক পত্রিকায় অর্থের বিনিময়ে বিজ্ঞাপন প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিলে ক্রীড়া জগতে ক্রম বাণিজ্যিকীরণের যে প্রবণতা গোটা বিশ্বে পরিলক্ষিত হয় তার প্রতিফলন লক্ষ করা যায় ভারতের এই প্রান্তিক জেলায়। ১৯৭১ সাল থেকে সংগঠনের পাক্ষিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়ে আসছে যদিও বিভিন্ন সময় পর্বে বিজ্ঞাপন প্রকাশের প্রবণতায় হ্রাস বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়।[৮২]

প্রাথমিক পর্বে জেলার খেলাধূলা গুলি প্রধানত চাকদহ, রাণাঘাট, কল্যাণী, কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর ও নবদ্বীপ- এর মতো শহর অঞ্চলগুলিতে সীমাবদ্ধ ছিল। খেলাধুলা যাতে শহরকেন্দ্রিকতা থেকে মুক্ত হয়ে ক্রমশ গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে পারে তার জন্যও বিশেষ উদ্যোগ লক্ষ করা যায়। জেলা ক্রীড়া সংস্থার অধীনস্থ আঞ্চলিক ক্রীড়া সংস্থাগুলি পূর্বে পুলিশ থানা ভিত্তিক গড়ে উঠলেও ১৯৭৬ সালে সরকারি স্তরে প্রত্যেকটি ব্লকে একটি করে ব্লক স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন গড়ে তোলার কথা বলা হয় মূলত দেশের ক্রীড়া মানের উন্নতির জন্য। সরকারি এই উদ্যোগের প্রতিফলন স্বরূপ নদীয়া জেলায় ব্লক ভিত্তিক ক্রীড়া সংস্থা গঠন করা হতে থাকে এবং ১৯৮২ সালে হরিণঘাটা ব্লকে আঞ্চলিক ক্রীড়া সংস্থা গঠন সম্পন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জেলার সব ব্লকেই আঞ্চলিক ক্রীড়া সংস্থা গঠন সম্পন্ন হয়। এছাড়াও ১৯৭৬ সাল থেকে বিভিন্ন খেলার প্রশিক্ষণ শিবির পৌর অঞ্চলের বাইরে প্রকৃত গ্রামাঞ্চলে আয়োজন করা হতে থাকে এবং একই সঙ্গে জেলা স্তরের বিভিন্ন প্রতিযোগিতা কৃষ্ণনগর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হওয়ার পরিবর্তে জেলার বিভিন্ন স্থানে সম্পন্ন করা হতে থাকে।[৮৩]

- **ষষ্ঠ অধ্যায়- জেলার বিশিষ্ট খেলোয়াড়, ক্রীড়া সংগঠক ও ক্রীড়া ক্লাব:**

নদীয়া জেলার বাসিন্দা একাধিক খেলোয়াড় রাজ্য, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে নিজেদের ক্রীড়া প্রতিভার স্বাক্ষর দিয়েছেন, নদীয়া জেলা ইতিহাস সংক্রান্ত যেকোনো আলোচনা এই সমস্ত খেলোয়াড়দের বর্ণনা ব্যতীত সম্পূর্ণ হতে পারে না। নদীয়া জেলার বেথুয়াডহরীর অধিবাসী দেবাশীষ মন্ডল ১৯৬৪ সালে টোকিও অলিম্পিকে জিমন্যাস্টিক বিভাগে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন, যিনি সম্ভবত জিমন্যাস্টিক বিভাগে অলিম্পিকে অংশগ্রহণকারী প্রথম ও একমাত্র বাংলার খেলোয়াড়।[৮৪] আন্তঃরাজ্য জুনিয়র হকি প্রতিযোগিতায় নদীয়ার অর্ধেন্দু চক্রবর্তী ঠাকুর বাংলা দলে স্থান পায় এবং ১৯৬৯ সালে বোম্বেতে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতার প্রতিটি খেলায় চূড়ান্ত দলের স্থান সহ একটি খেলায় গোলও করেন। কৃষ্ণনগরের নিবাসী মোহাম্মদ আলম দক্ষিণ কলকাতার ফিজিক্যাল কালচার জিমনাসিয়ামে অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ ভারত্তোলন ও দেহ গঠন সমিতি কর্তৃক

---

৮২. *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ*।

৮৩. *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ*।

৮৪. *The Times of India.*

পরিচালিত বঙ্গশ্রী দেহসৌষ্টব প্রতিযোগিতায় ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি গ্রুপে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং বঙ্গশ্রী উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯৭১ সালে আমেদাবাদে অনুষ্ঠিত আন্তঃরাজ্য স্পোর্টস- এর নবম বার্ষিক অনুষ্ঠানে কৃষ্ণনগর অ্যাথলেটিক ক্লাবের গোপাল বিশ্বাস ১৮ বছর অনূর্ধ্ব বালক বিভাগে বাংলা দলের পক্ষে দীর্ঘ লম্ফনে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। নদীয়া জেলা ফুটবল দলের খেলোয়াড় প্রসাদ তরফদার পশ্চিমবাংলা দলের সদস্য হিসেবে ১৯৮১ সালে কেরালার কোচিনে অনুষ্ঠিত ভারতীয় জুনিয়র ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। ১৯৮১ সালে কানপুরে অনুষ্ঠিত জাতীয় জুনিয়র ভলিবল প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গের যে দল অংশ নেয়, তাতে নদীয়ার দুজন খেলোয়াড় স্থান পাই চাকদহ তরুণ সমিতির খেলোয়াড় মদনমোহন সাহা ও কৃষ্ণনগর ভারতী সংঘ ক্লাবের খেলোয়াড় জাইদুল হাসান। শান্তিপুর সবুজ সংঘের খেলোয়াড় সুবীর বসাক পশ্চিমবঙ্গ দলের খেলোয়াড় হিসেবে ১৯৮৫ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সেরা ফুটবল খেলোয়াড়ের স্বীকৃতি লাভ করে। কৃষ্ণনগরের অমর ভারতী সংঘের খেলোয়াড় সৌতম মিত্র সর্বপ্রথম নদীয়ার খেলোয়াড় হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের রঞ্জিদলে নির্বাচিত হন ১৯৮৬ সালে। গৌহাটিতে অনুষ্ঠিত সারা ভারত গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী পশ্চিমবঙ্গ ফুটবল দলে নদীয়ার নবদ্বীপ অঞ্চলের অন্তর্গত চড়ব্রহ্মনগরের সেবক সমিতির খেলোয়ার শ্যামল ভৌমিক অন্তর্ভুক্ত হন। সি.এ.বি- এর বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে (১৯৮৭–৮৮) কৃষ্ণনগরের ইয়ংস্টার ক্লাবের সদস্য রবীন্দ্রনাথ দাস পশ্চিমবঙ্গের সব জেলার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সাব-জুনিয়র ক্রিকেটার নির্বাচিত হন। ১৯৯৫ সালে ৪৫ তম রাজ্য অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় সাব-জুনিয়র বালিকা বিভাগে নদীয়ার খেলোয়াড় সারথি বর্মন সেরা অ্যাথলিট নির্বাচিত হন। ওই একই বছর জাতীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে (মধ্যপ্রদেশের ভূপালে অনুষ্ঠিত) সারথি বর্মন নিজ বিভাগে ১০০ মিটার দৌড়ে ও লং জাম্পে প্রথম হন এবং অ্যামেচার অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়া (এ.এ.এফ.আই) সারথি বর্মনকে দেশের সেরা জুনিয়র অ্যাথলিট হিসেবে পুরস্কৃত করে। ওই একই প্রতিযোগিতাই জুলফিকার হক মন্ডল অনূর্ধ্ব ১৭ বছর বিভাগে হাই জাম্পে প্রথম স্থান লাভ করে। দেবগ্রাম কালচারাল সোসাইটির হয়ে ১৯৮১-৮৫ সাল পর্যন্ত নদীয়া জেলার বার্ষিক স্পোর্টসে অংশগ্রহণকারী জ্যোতির্ময়ী সিকদার ১৯৯৮ সালে ব্যাংকক এশিয়ান প্রতিযোগিতায় জোড়া সোনা ও একটি রুপোর পদক লাভ করেন। আনন্দবাজার পত্রিকায় ক্রীড়া সম্পাদক শ্রী রূপক সাহা পত্রিকায় লেখেন জেলা থেকে খেলোয়াড় সরবরাহের তালিকায় নদীয়া এখন সেরা জ্যোতির্ময়ী-এর দৌলতে।

বাদকুল্লা অনামী ক্লাবের হয়ে নিয়মিত নদীয়া জেলা অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী রাখি বিশ্বাস ২০০৩ সালে সুরাটে অনুষ্ঠিত জাতীয় ভারউত্তোলন প্রতিযোগিতায় ‘স্টেংথ লিফটিং’ বিভাগে ৭৫ কেজি ক্যাটাগরিতে প্রথম স্থান দখল করেন। ৪৭ তম জাতীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ যা ২০০৩ সালে জামশেদপুরে অনুষ্ঠিত হয় সেখানে জেলার দুজন অ্যাথলিট শিল্পী ঢালী ও ডলি সরকার ৪x৪০০ মিটার রিলে দৌড়ে বাংলা দলের হয়ে অংশগ্রহণ করে এবং প্রথম হয়ে স্বর্ণপদক লাভ করে। ২০০৬ সালের ৫৬ তম রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় নদীয়া দলের খেলোয়াড় দেবশ্রী মজুমদার প্রতিযোগিতার সেরা অ্যাথলিট ঘোষিত হন এবং ওই একই বছর ১৮ তম ইস্ট জোন অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় দেবশ্রী ১০০ মিটার, ৪০০ মিটার ও রিলে দৌড়ে প্রথম স্থান দখল করে পূর্ব জোনে ‘বেস্ট পারফর্ম অ্যাটলিট’

হবার সম্মান লাভ করে। ২০০৭ সালে পাটনায় অনুষ্ঠিত পূর্ব জোন অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় নদীয়া জেলার তিনজন অ্যাথলিট বাংলা দলের হয়ে অংশ নেয় এবং দেবশ্রী মজুমদার ২০০ ও ৪০০ মিটার দৌড়ে প্রথম, রোজিনা খাতুন হাই জাম্পে দ্বিতীয় ও সুমিতা রায় ব্রড জাম্পে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। রানাঘাট পাল চৌধুরী হাই স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র ও রানাঘাট স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন ক্লাবের খেলোয়াড় সায়ন মন্ডল, অম্বর রায় টুর্নামেন্টের সেরা বোলার হিসেবে, সি.এ.বি কর্তৃক অনূর্ধ্ব ১৪ বিভাগে সেরা ক্রিকেটার- এর মর্যাদা লাভ করেন ২০১০ সালে। নদীয়া জেলা ফুটবল লীগে নিয়মিত অংশগ্রহণকারী চাকদহের অগ্রদূত ক্লাবের খেলোয়াড় অনুপম সরকার সন্তোষ ট্রফি জয়ী বাংলা দলের অধিনায়ক হিসেবে রাজ্য সরকার কর্তৃক গোটা দল সহ সংবর্ধিত হন। নবম জাতীয় আন্তঃজেলা জুনিয়র অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা যা ঝাড়খণ্ডের রাঁচিতে ২০১১ সালে অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে জেলার রাণাঘাটের হালালপুর বিবেকানন্দ সংস্কৃত পরিষদ ক্লাবের অনিতা দাস অনূর্ধ্ব-১৪ বছর বিভাগে ৫.২১ মিটার লাফিয়ে লং জাম্পে জাতীয় পর্যায়ের রেকর্ড করেন। ওই একই বছর হায়দ্রাবাদে জাতীয় জুনিয়র ভলিবল প্রতিযোগিতায় অসামান্য দক্ষতা প্রদর্শনের স্বীকৃতি স্বরূপ শান্তিপুরের শান্তিস্মৃতি সংঘের শান্তনু দেবনাথ ভলিবলে অনূর্ধ্ব-১৪ বছর বিভাগে, ২০১১ মরশুমে বাংলার বর্ষসেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন। সর্বভারতীয় অ্যাথলেটিক্স সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত ২৫ তম জাতীয় আন্তঃআঞ্চলিক জুনিয়র অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় রানাঘাট হালালপুর বিবেকানন্দ সংস্কৃত সংঘের অনিতা দাস বাংলা দলের হয়ে বালিকা ১৬ বছর বিভাগে লং জাম্পে রূপো ও ১০০ মিটার দৌড়ে ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন। চাকদহ নবীন সংঘের খেলোয়াড় ও নদীয়া জেলা দলের নিয়মিত খেলোয়াড় সায়ন ঘোষ, ২০১৪ সালে মুম্বাইতে অনুষ্ঠিত মুশতাক আলী ক্রিকেট টুর্নামেন্টে সি.এ.বি সিনিয়র ক্রিকেট দলে প্রতিনিধিত্ব করেন এবং নিয়মিত প্রথম একাদশে খেলে ভালো প্রদর্শন করেন। সায়ন ঘোষ ২০১৫ সালে ক্রিকেটে বাংলার রঞ্জি দলে নির্বাচিত হন এবং বিদর্ভ রাজ্যের সাথে খেলায় তার রঞ্জি অভিষেক ঘটে। ২০১৫ সালে বাংলা মহিলা ক্রিকেট দলে তেহট্টের প্রিয়াংকা বালা ও কৃষ্ণনগরের পম্পা সরকার এবং অনূর্ধ্ব ১৯ বছর বাংলা মহিলা দলে বাদকুল্লার রূপা দত্ত ও চাকদহের অম্বিকা গুহ নিয়মিত খেলেন। ওই একই বছরে ১৩ তম সর্বভারতীয় আন্তঃজেলা বয়স ভিত্তিক অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় জেলার অ্যাথলিট রুবিনা খাতুন বালিকা অনূর্ধ্ব ১৪ বছর বিভাগে লং জাম্পে ও সুমিতা ভৌমিক বালিকা অনূর্ধ্ব ১৬ বছর বিভাগে ৪০০ মিটার দৌড়ে প্রথম হন এবং ২৭ তম পূর্বাঞ্চল জাতীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় সুমিত্রা ভৌমিক ৪০০ মিটার দৌড়ে ও রুবিনা খাতুন লং জাম্পে প্রথম হয়ে সোনার পদক লাভ করেন। পূর্বাঞ্চল জাতীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ ২০১৬ তে বাংলা দলের হয়ে জেলার খেলোয়াড় সুরভী বিশ্বাস অনূর্ধ্ব কুড়ি বছর বিভাগে ডিসকাস ও শটপুটে এবং প্রিয়াঙ্কা হালদার অনূর্ধ্ব ১৪ বছর বিভাগে ১০০ মিটার দৌড়ে প্রথম হয়ে সোনার পদক লাভ করেন। ব্রাজিলের রিও অলিম্পিকে ভারতের অ্যাথলিটদের মধ্যে বাংলার একমাত্র অ্যাথলিট নদীয়ার মেয়ে দেবশ্রী স্থান লাভ করে এবং এর পরের বছর ২০১৭ সালে এশীয় অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় তিনি সোনার পদক লাভ করেন 4x৪০০ মিটার রিলে দৌড়ে।[৮৫]

---

৮৫. *আনন্দবাজার পত্রিকা।*

ক্রীড়া সংক্রান্তকার্য যথার্থভাবে পরিচালনা ও খেলাধুলার ক্রম উন্নতি সাধনের ক্ষেত্রে ক্রীড়া সংগঠকদেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। বিশিষ্ট খেলোয়াড়দের পাশাপাশি নদীয়ার একাধিক ক্রীড়া সংগঠক রাজ্য, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে তাদের সাংগঠনিক দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৭৬ সালে রাজ্য ক্রীড়া পরিষদ পুনর্গঠন করে ক্রীড়ামন্ত্রী প্রফুল্ল ক্রান্তি ঘোষের সভাপতিত্বে ২৫ সদস্যের একটি পরিষদ গঠন করে। এই ক্রীড়া পরিষদের সকলেই কলকাতার ক্রীড়া মহলের সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব হলেও মফস্বল থেকে একমাত্র সদস্য মনোনীত হন নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক গোবিন্দ প্রসাদ দত্ত। উল্লেখ্য অনুরূপভাবে ১৯৬৮ ও ১৯৬৯ সালেও রাজ্য ক্রীড়া পরিষদে মফস্বল থেকে একমাত্র সদস্য ছিলেন জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রাক্তন সম্পাদক এস.এম. বদরুদ্দীন। জেলা ক্রীড়া সংস্থার অন্যতম সহ সাধারণ সম্পাদক শিবদাস রায় ১৯৮২ সালে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত নবম এশিয়ান গেমসে পশ্চিমবাংলা থেকে নির্বাচিত বিচারক দলের অন্যতম সদস্য হিসাবে অ্যাথলেটিক্স বিভাগের স্বীয় ক্ষেত্রে কৃতিত্বের পরিচয় দেন। ১৯৮৬ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি ক্রীড়া দিবস উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার রাজ্যের ১২ জন ক্রীড়া সংগঠক ব্যক্তিকে তাদের সংগঠন শক্তি ও কর্ম কুশলতার স্বীকৃতি স্বরূপ পুরস্কৃত করে। এই পুরস্কার প্রাপকদের মধ্যে অন্যতম হলেন নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার সহ-সভাপতি তথা ওয়ার্কিং কমিটির চেয়ারম্যান এস.এম. বদরুদ্দীন। দিল্লিতে ১৯৮৭ সালে অনুষ্ঠিত বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় আম্পেয়ারিং করার জন্য নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার অন্যতম ডেপুটি সেক্রেটারি হরপ্রসাদ মুখার্জী নিয়োগপত্র লাভ করেন। ১৯৮৭ সালে রাজ্য স্পোর্টস কাউন্সিল ক্রীড়া দিবসে কুড়ি জন ব্যক্তিকে সম্মানিত করে যার মধ্যে ছিলেন জেলা ক্রীড়া সংস্থার সহ-সভাপতি ও ওয়ার্কিং কমিটির চেয়ারম্যান গোবিন্দ দত্ত এবং ১৯৮৮ সালে এই পুরস্কার লাভ করেন জেলার অন্যতম ক্রীড়া সংগঠক শঙ্করীচরণ চট্টোপাধ্যায়। জেলা সংস্থার প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক গোবিন্দ প্রসাদ দত্ত ১৯৯৫ সালে সি.এ.বি- এর সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন।[৮৬]

নাগপুরে ২০০০ সালের ১৯শে মার্চ অনুষ্ঠিত ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে একদিনের ক্রিকেট সিরিজের পঞ্চম তথা শেষ একদিনের খেলায় অন্যতম আম্পিয়ার হিসেবে মাঠে নামেন কৃষ্ণনগরের শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগার ও নদীয়া জেলা দলের প্রাক্তন নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় কৃষ্ণনগরের বাসিন্দা ফ্রান্সিস গোমেজ। নদীয়ার মানুষ হিসেবে তিনি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলায় প্রথম এই কৃতিত্ব দেখালেন। সর্বভারতীয় অ্যাথলেটিক্স সংস্থার (অ্যামেচার অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া) পূর্ণ দায়িত্বপ্রাপ্ত টেকনিক্যাল কমিটির অন্যতম সদস্য নিযুক্ত হন ২০০০ সালে, জেলা ক্রীড়া সংস্থার অন্যতম সহ-সভাপতি ও ওয়ার্কিং কমিটির চেয়ারম্যান শিবদাস রায়। পশ্চিমবঙ্গ থেকে অন্য কেউ এই কমিটিতে এর আগে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন বলে জানা যায় না। সি.এ.বি কর্তৃক ২০১০-১১ মরশুমে ক্রিকেটে বর্ষসেরা আম্পিয়ার নির্বাচিত হন বীরনগরের বাসিন্দা দেবতোষ মুখার্জি। দেশের প্রাচীনতম ক্রীড়া সংগঠন ও বাংলার ফুটবল নিয়ামক সংস্থা আই.এফ.এ- এর ২০১২ সালে

---

৮৬. *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ*।

গভর্নিং বডির সভায় আই.এফ.এ- এর সহ-সচিব নির্বাচিত হন জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক জয়ন্ত চ্যাটার্জি।[৮৭]

জেলার খেলাধুলা সংক্রান্ত কার্য তৃণমূল স্তরে পরিচালিত হয় একাধিক ক্রীড়া সংক্রান্ত ক্লাবের দ্বারা। এই সমস্ত ক্লাবগুলি নিজেদের ক্ষুদ্র পরিসরে ক্রীড়া সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য সম্পাদনের মাধ্যমে ক্রীড়া ক্ষেত্রে প্রতিভাবানদের খেলোয়াড় হিসেবে গড়ে তোলার প্রাথমিক রসদ সরবরাহ করে থাকে। জেলার প্রায় প্রতিটি অঞ্চলেই এই সমস্ত ক্লাবগুলি গড়ে উঠেছে এবং নদীয়ার যে সমস্ত খেলোয়াড় রাজ্য, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে নিজেদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছে তাদের প্রায় প্রত্যেকেই জেলার কোনো না কোনো ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত থেকেছে, তাদের খেলোয়াড় জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে। এই ক্লাব গুলি ক্রীড়া সংক্রান্ত কার্যের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক কার্যের সঙ্গেও যুক্ত থাকে। বিভিন্ন ক্লাবগুলি নিজেদের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দুস্থদের সাহায্য করা, বন্যার মত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় ত্রাণ ও সাহায্যের ব্যবস্থা করা, রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা প্রভৃতি কাজের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত রাখে। এছাড়া সাংস্কৃতিক কার্যেও ক্লাবগুলি নিজেদের অবদানের স্বাক্ষর তুলে ধরে স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস ও বিভিন্ন মনীষীদের জন্ম বা মৃত্যুদিনে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে। অধিকাংশ ক্লাবগুলি নিজেদের অঞ্চলে দুর্গাপূজা, কালী পূজার মতো বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। জেলার ক্রীড়া ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এই ক্লাবগুলোর অবদান তুলে ধরা আবশ্যক। সমগ্র জেলাজুড়ে একাধিক ক্লাব গরে উঠলেও নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার দ্বারা অনুমোদিত এবং ক্রীড়া ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা ক্লাবগুলোর বর্ণনা তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে উক্ত গবেষণাকার্যে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর সূচনার দিকে জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে ক্লাবগুলি গড়ে উঠতে থাকে এবং প্রাথমিক পর্যায়ে চাকদহ, কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর, রাণাঘাট ও নবদ্বীপের মতো পৌরসভা অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল ক্লাবগুলি। ১৮৯০ সালে কৃষ্ণনগরে প্রথম টাউন ক্লাব গড়ে ওঠে। এই পর্বে কৃষ্ণনগরে মিনার্ভা স্পোর্টিং, সবুজ সংঘ, অনন্ত হরি ক্লাব, মুসলিম ক্লাব ইত্যাদি গড়ে উঠলেও তা বেশিদিন টিকে থাকেনি। স্বাধীনতা লাভের পর ক্লাবের সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে- হিরোজ ক্লাব (১৯৪০), কৃষ্ণনগর সাউথ ক্লাব, অগ্রণী সংঘ (১৯৫৩), শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগার ইত্যাদি গড়ে ওঠে। শান্তিপুরের ক্লাবগুলোর মধ্যে- শান্তিপুর স্পোটিং ইউনিয়ন, শান্তিপুর মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব, ন্যাশনাল ক্লাব, সূএাগড় স্পোর্টিং ক্লাব, নবদ্বীপের ক্লাবগুলোর মধ্যে- নবদ্বীপ অ্যাথলেটিক ক্লাব, নদিয়া ক্লাব, রাণাঘাটের ক্লাব গুলির মধ্যে- রাণাঘাট টাউন ক্লাব, রাণাঘাট স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন, রাণাঘাট হ্যাপি ক্লাব, ভারতী সংঘ, চাকদহের ক্লাব গুলির মধ্যে- নবীন সংঘ, লাইফ ফর ডু

---

৮৭. *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ*।

প্রাচীনতম ও উল্লেখযোগ্য ক্লাব। ১৯৭০- এর দশকের পর থেকে ক্লাবের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি হয় এবং গ্রামাঞ্চলেও নতুন ক্লাব গড়ে উঠতে থাকে। এই ক্লাবগুলি ক্রীড়া ক্ষেত্রে অসাধারণ দক্ষতা প্রদর্শন এর মাধ্যমে প্রমাণ করে উপযুক্ত সুযোগ পেলে গ্রামাঞ্চল থেকেও প্রতিভাবান খেলোয়াড় লাভ সম্ভব। পৌর অঞ্চলের বাইরে অবস্থিত পল্লীগ্রামের ক্লাব গুলির মধ্যে বাদকুল্লার অনামী ক্লাব ও রাণাঘাটের সন্নিকটে অবস্থিত হালালপুর বিবেকানন্দ সংস্কৃত সংঘ বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। এদের মধ্যে অনামী ক্লাব ২০১২ সালে জেলা অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মাধ্যমে একটানা সাতবার এই প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হবার অনন্য কৃতিত্ব অর্জন করে। হালালপুর বিবেকানন্দ সংস্কৃত সংঘ জেলা অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় একাধিক বার দ্বিতীয় স্থান দখল করে এবং এই ক্লাবের অনেক খেলোয়াড় রাজ্য ও জাতীয় স্তরে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। এছাড়াও বেথুয়াডহরি, তেহট্ট, আড়ংঘাটা প্রভৃতি গ্রামাঞ্চলের ক্লাবগুলিও একাধিক প্রতিভাবান খেলোয়াড় উপহার দিয়েছে।[৮৮]

- **সপ্তম অধ্যায়- নদীয়া জেলায় খেলার আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট ও আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে খেলা:**

স্থানীয় ইতিহাস সমৃদ্ধ না হলে বৃহত্তর ইতিহাস সমৃদ্ধ হয় না। নদীয়া জেলার ক্রীড়া ইতিহাস সংক্রান্ত গবেষণা এই জেলার ইতিহাস কে সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি বৃহত্তর ক্রীড়া ইতিহাসের ধারা কেউ সমৃদ্ধ করে তুলবে। জেলার ক্রীড়া বিবর্তনের ধারা পর্যবেক্ষণ করলে লক্ষ করা যায়, প্রথমে জেলায় হকি ও ফুটবলের মত খেলা জনপ্রিয় থাকলেও ১৯৮০- এর দশকের পর থেকে ক্রমশ ক্রিকেট প্রধান খেলা হয়ে ওঠে, যা ভারতের ক্রীড়া বিবর্তনে ফুটবল ও হকির স্থানে ক্রিকেটের সর্বগ্রাসী আধিপত্য স্থাপনের এক ক্ষুদ্র জেলা ভিত্তিক সংস্করণ তুলে ধরে। ক্রীড়া ক্ষেত্রে অবদানের কথা বললে জেলার অ্যাথলিটদের অবদান যেকোনো দলগত ক্রীড়ার থেকে অধিক এবং এক্ষেত্রে মহিলা অ্যাথলিটদের সাফল্য যথেষ্ট শ্লাঘার বিষয়। ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গের এক প্রান্তিক জেলায়, অ্যাথলেটিক্স- এর মতো ক্রীড়া ক্ষেত্রে অবহেলিত প্রান্তিক খেলায়, সমাজের প্রান্তিক অবহেলিত গোষ্ঠী হিসেবে পরিগণিত মহিলাদের সাফল্য যথার্থই প্রান্তিক ইতিহাসের ধারাকে তুলে ধরে। জেলার মহিলা অ্যাথলিটদের অসাধারণ সাফল্য সত্ত্বেও ক্রীড়া সংগঠকদের মধ্যে ও ক্লাব সংগঠকদের মধ্যে মহিলা সদস্যের অনুপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। জেলা ক্রীড়া সংস্থার কোন সাংগঠনিক পদে কোনো মহিলা সদস্য কখনোই নিযুক্ত হননি, ক্লাব গুলির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। পরিশেষে বলা যায় নদীয়া জেলার ক্রীড়া ইতিহাস সংক্রান্ত গবেষণা জেলার ক্রীড়া ইতিহাস কে যথার্থভাবে সংরক্ষণ করে খেলার মাধ্যমে সামাজিক ইতিহাসের ধারাকে বর্ণনা করে সামগ্রিক ইতিহাস বোধ কে করে তুলবে সমৃদ্ধ।

---

৮৮. *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ*।

- **অষ্টম অধ্যায়- উপসংহার:**

পরিশেষে স্বাধীনতা উত্তর পর্বে নদীয়া জেলার খেলাধুলার ইতিহাস বর্ণনার ক্ষেত্রে গবেষণা কার্যটি কতটা সফল তার মূল্যায়নের চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে গবেষণা কার্যটির মাধ্যমে যে সামগ্রিক ধারণা লাভ করেছি তার সংক্ষিপ্তসার প্রদানের প্রচেষ্টা করা হয়েছে। একই সঙ্গে কোন কোন ক্ষেত্রে গবেষণা সন্দর্ভটির সীমাবদ্ধতা রয়েছে তাও তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে, যাতে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার বিষয়টিও তুলে ধরা সম্ভব হয়।

তত্ত্বাবধায়কের স্বাক্ষর **গবেষকের স্বাক্ষর**